পিচুটাকে

পিছু ডাকে

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী



শান্তি লাইব্রেরী

কলিকাতা



পিছু ডাকে

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৩

প্রকাশক : অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তি লাইব্রেরী

১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

মুদ্রক : সন্তোষকুমার ধর

ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস

৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট : সনৎ কর

ব্লক : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং

ব্লক মুদ্রণ : মোহন প্রেস

তিন টাকা

পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতির
উদ্দেশ্যে

শান্তির বই :

ঊর্মিমালা
যেতে নাহি দিব
সুন্দর, হে সুন্দর
শিখারূপিণী
মেঘ ও চাঁদ
রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী
রবীন্দ্রনাথের পূরবী
রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা
গল্পকার শরৎচন্দ্র
পিছু ডাকে

জীবনের পঞ্চাশটি বৎসর পার হইয়া আসিলাম। আশার প্রাসাদ ছাড়িয়া স্মৃতির পর্ণকুটিরে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছি। ভবিষ্যতের কাঞ্চন-চূড়া মরীচিকার মত কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, আজ বসিয়া বসিয়া অতীতের মরা-নদীর লহরী গুনিতেছি। কিন্তু কাহারও বিরুদ্ধে কোন নালিশ নাই। এইবার অপরাহ্নের পড়ন্ত রৌদ্রে বসিয়া শীতক্লিষ্ট শরীরটিকে ভাল করিয়া তাতাইয়া লইবার পালা,—পশ্চিম দিগন্তের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সূর্যাস্তের জন্য অপেক্ষা করার পালা। ইহাও এক নূতন ধরণের অভিজ্ঞতা—ইহাকেও ভালো করিয়া উপভোগ করিতে চাই।

পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিতে বড় ভালো লাগে। অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া এই দেহ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, দেহের মধ্যে এই মন তিলে তিলে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম, পরিচয়, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, শত্রুতা, ঘৃণা,—বহু পথ ধরিয়া বহু নরনারী জীবনের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে কিছু কিছু পাইয়াছি। এত পাইয়াছি যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঋণীই রহিয়া যাইব। তাহাদের সকলের কথা আজ আর মনে পড়ে না। কেহ বা মরিয়া গিয়াছে, কেহ বা কালস্রোতের আবর্তে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। কত পুরাতন ছাড়িয়া গিয়াছে, কত নূতন আসিয়াছে। পূর্বস্মৃতির খিড়কির দরজা খুলিয়া পিছনের দিকে উঁকি মারিয়া এই সব নূতন পুরাতনের আনাগোনার দিকে চাহিয়া থাকিতে বড় ভালো লাগে।

বিশেষ করিয়া বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতিগুলি বড় মধুর বলিয়া মনে হয়। কর্মচাঞ্চল্যের ভরানদীতে মাঝে মাঝে যখন ভাঁটা লাগে, বিরল অবসর-মুহূর্তগুলি সুমধুর আলস্যের রসে ভরিয়া উঠে

—তখন সহসা মনের মধ্যে সেই সুদূর জীবনের স্মৃতি-চিত্রশালার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। পাঠশালা-পলাতক শিশুর মত কর্তব্যের বোঝা কাঁধ হইতে নামাইয়া ফেলিয়া সেই অকাজের মায়াপুরীতে অকারণেই ঘুরিয়া বেড়াই। একটি গাছ, একটি নদী, একটি পাখি, এক টুকরা হাসি, এক ফোঁটা চোখের জল—নানা অসংলগ্ন ছবির মালা চোখের সামনে ছুলিতে থাকে। কখনো বা অনেকগুলি ছবি এক সঙ্গে জড়াইয়া যায়—একটা সম্পূর্ণ ঘটনা বা একটা গোটা মানুষ অদৃশ্য পটুয়ার তুলির আঁচড়ে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে।

আর সকল ছবির পিছনে ভাসিয়া উঠে একখানি ছোট গ্রামের ছবি। তাহার মাঠে-বনে, তৃণে-বৃক্ষে, নদীতে-পুষ্করিণীতে, আকাশে-আঙিনায় শৈশবের স্বর্গ হইতে যেন এক ঝলক্ অপার্থিব আলোক ঝরিয়া পড়িয়া নিশ্চল হইয়া আছে। তাহার মাটিতে হরিচন্দনের গন্ধ, জলে মাতৃস্তন্যের আস্বাদ, বায়ুতে বন্ধুর প্রীতিস্পর্শ, রৌদ্রে দেবতার আশীর্বাদ। উচ্ছ্বাস বল, অতিরঞ্জন বল,—সব মাথা পাতিয়া মানিয়া লইব, কেবল মিথ্যা বলিও না। আমার সমগ্র সত্তার শিকড় যেখানে নিহিত তাহাকে যদি মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে আমি নিজেই যে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া যাইব। একথা হয়তো সত্য যে আজ সেখানে গিয়া একটানা এক মাসের বেশী বাস করিতে পারিব না। বিজলি বাতির অভাব, কলের জলের অভাব, শিক্ষাদীক্ষার অভাব, নাগরিক বৈদগ্ধ্যের অভাব—নানা অভাবে পীড়িত হইয়া মন পালাই পালাই করিতে থাকিবে। তথাপি একদিন যাহা সত্য ছিল চিরদিন তাহা সত্য থাকিবে—বর্তমান অনুভূতির তীব্রতার মধ্য দিয়া, অতীত স্মৃতির স্বপ্নমোহের মধ্য দিয়া নিজের অস্তিত্বের ছাপ আমার মনের উপর রাখিয়া যাইবে। সকল রসের উর্ধ্বে জীবনরসের স্থান, আর এই গ্রামখানিই চিরকাল আমার জীবনরসের উৎস হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে অস্বীকার করিব কি করিয়া? মাতৃগৃহ হইতে চির-নির্বাসিত হইলেও কি মাকে অস্বীকার করা যায়?

এই গ্রামের নরনারীকে কোনদিন পর বলিয়া ভাবিতে পারিব না। মানস-লোকের সম্পর্কে তাহারা সকলেই আমার পরমাত্মীয়। তাহা ছাড়া কৃতজ্ঞতার ঋণও অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে—সমগ্র বাল্য ও কৈশোর ধরিয়া আমি ছিলাম গ্রহীতা, তাহারা ছিল দাতা। তাহাদেরই বিন্দু বিন্দু দানে আমার প্রাণের পেয়ালা উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারাই ছিল আমার জীবনরসের জোগানদার।

যাহাদের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়ে তাহারা কেহই আমার সমবয়স্ক ছিল না। কেহ কেহ তখন বার্ধক্য বা প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পা দিয়াছিল, সকলেই ছিল বড়দের পর্যায়ভুক্ত। যাহাদের সঙ্গে খেলা করিয়াছি, মারামারি করিয়াছি, ইস্কুল-পাঠশালায় গিয়াছি, তাহাদের কেহই মনের উপর বিশেষ ছাপ রাখিয়া যায় নাই। তাহাদের অনেকের সঙ্গে এখনও মাঝে মাঝে দেখা হয়, কেহ কেহ বেশ অন্তরঙ্গও হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু মনে হয় অন্যরূপ অবস্থায় পড়িলে তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে ভুলিয়া যাইতে পারিতাম। হয়তো এমন একদিন আসিবে যেদিন ইহাদের সকলকেই ভুলিয়া যাইব। কখনও ভুলিতে পারিব না তাহাদিগকে যাহারা আজ সেকালের লোক হইয়া গিয়াছে। তাহাদের কথা প্রায়ই ভাবি,—ভাবিয়া আনন্দ পাই। তাই আজ তাহাদের কথা বলিতে বসিয়াছি। তাহাদের অনেকেই আজ ইহলোকে নাই। যে দুই একটি বৃদ্ধ বৃদ্ধা এখনও বাঁচিয়া আছে তাহারাও জীবন স্রোত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এ যুগের মানুষ তাহাদিগকে চেনে না, বোঝে না। অপরিচয়ের প্লাবনের মধ্যে উদ্গত শিলাখণ্ডের মত তাহারা টিকিয়া আছে মাত্র, কিন্তু জগতের সহিত তাহাদের সকল যোগসূত্রই ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

এই কথাটিই ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিতে চাই। যুগ-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। যে গ্রামটির ছবি আমার মানস-শিলার অক্ষয়

পটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে সে গ্রাম আর নাই। ভৌগোলিক অস্তিত্বের কথা বলিতেছি না, রস-রূপের কথা বলিতেছি। সামাজিক সংস্থিতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে, দৃষ্টি-কোণ ঘুরিয়া গিয়াছে। এখন জোত-জমির চেয়ে জুতা-জামা বেশী মূল্যবান হইয়া উঠিয়াছে, চাকরাণ ছাড়িয়া লোক চাকরীর সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঘরে গরুর বদলে গ্রামোফোন আসিয়াছে, মেয়েরা ব্রত-পূজা ছাড়িয়া ব্রতচারী নৃত্য অভ্যাস করিতেছে। সামাজিক দলাদলি আর নাই, তাহার পরিবর্তে প্রতি পাড়ায় একখানি করিয়া 'সার্বজনীন' পূজার পত্তন হইয়াছে। পুরোহিত ঠাকুর বাজারে ঘর ভাড়া করিয়া 'দশকর্মভাণ্ডার' খুলিয়াছেন, সুদখোর মহাজন লগ্নীকারবার গুটাইয়া লোন অফিসের ডিরেক্টর হইয়া বসিয়াছে। পাঠশালার গুরুমহাশয় ছাত্রের সিধার পরিবর্তে সরকারের বেতন লইয়া 'বিনামূল্যে' বিদ্যা বিতরণ করিতেছেন। বৈরাগীর দল ব্ল্যাক মার্কেটে ব্যবসা ধরিয়াছে, —একতারা মন্দিরা ছাড়িয়া হারমোনিয়াম সহযোগে 'লোক-সঙ্গীতের' চর্চা করিতেছে। সমাজপতির নিষ্ঠুর নির্যাতন ঐতিহাসিক কাহিনীতে পর্যবসিত হইয়াছে, কিন্তু কাঞ্চন-কৌলীন্যের নব্য বর্বরতা হিংস্র নখ-দন্ত বাহির করিয়া নগ্ন মূর্তিতে দেখা দিয়াছে। মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এত বড় একটা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে তাহাকে ছোটখাট ধরণের বিপ্লব বলিলেই বোধ হয় ভালো হয়।

সত্যই যুগ-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। ভালো-মন্দর কথা বলিতেছি না, তুলনা-মূলক সমালোচনা করিয়া সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার স্পর্ধা রাখি না। কি ছিল, কি হইয়াছে—বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেও বসি নাই। আমি শুধু বলিতে চাই, যাহা ছিল তাহা আর নাই।

সে মানুষও আর নাই। জাতির মনের ভিতরও একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে। একথা আমি কখনো বলিতে চাই না যে সেকালের

লোক সবাই ভালো ছিলো, আর একালের লোক সকলেই মন্দ। আমি নিজেও তো একালেরই লোক। আকাশে থুতু ফেলিলে যে নিজের গায়েই আসিয়া পড়িবে! সত্য কথা বলিতে কি, নিছক ভালো-মন্দর অনুপাত কষিয়া দেখিলে সেকালে একালে বিশেষ পার্থক্য কিছু বোঝা যাইবে না। না—ভালো-মন্দর কথা নহে, বলিতেছি এমন একটি জিনিসের কথা যাহার সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়তো সহজ নহে কিন্তু যাহাকে বুঝিতে পারা খুবই সহজ। মানব-জীবন পারিপার্শ্বিক বস্তুজগতের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবার ক্ষমতা যেখান হইতে আহরণ করে, যেখান হইতে প্রাণ-রস শোষণ করিয়া আত্মপরিপুষ্টি সাধন করে, ইতিহাস-কিংবদন্তী-ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনার লীলাময় যে জগৎ হইতে সহজ সংস্কারগুলি চয়ন করে—বিপ্লবটি ঘটিয়াছে সেইখানে। তাই আজ সেকাল ও একালের মধ্যে অপরিচয়ের এই স্থূল যবনিকার ব্যবধান।

যে বয়সে পৌঁছিয়াছি পৌরাণিক যুগ হইলে সে বয়সে বনে গিয়া বাস করিবার কথা। কিন্তু সে মনও নাই, সে বনও নাই। তাহার পরিবর্তে বসিয়া আছি দক্ষিণ কলিকাতার জনারণ্যের মধ্যে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র কোটরে। সেইখানে বসিয়া বসিয়া পিছনের দিকে চোখ ফিরাই—পূর্বস্মৃতির ছায়ান্ধকার বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াই। বন বলিব না উপবন বলিব বুঝিতে পারি না। ফুল আছে, পাখি আছে, স্নিগ্ধ ভিজামাটির গন্ধ আছে; কিন্তু কাঁটারও তো অভাব নাই,—বিষবল্লীর কথা, কৃষ্ণসর্পের কথাও তো ভুলিতে পারিব না। ভুলিবার প্রয়োজনও নাই। সব কিছু লইয়াই ছিল সেই জগৎ—তাহার সব কিছুরই স্মৃতি আজ মর্মকোষের নিভৃত রসায়নে মধুর হইয়া উঠিয়াছে।

বাল্যের স্মৃতি, কৈশোরের স্মৃতি! বয়স তখন ছিল কাঁচা, মনটাও কাঁচা ছিল। এক তাল নরম কাদার উপর আঙুলের ছাপ

যেমন স্পষ্ট ও গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়, তখনকার প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি মানুষ ঠিক তেমনি করিয়া আমার মনের উপর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। আজ অবশ্য মন আর কাঁচা নাই, স্বার্থবুদ্ধির উত্তাপে শুকাইয়া পাকিয়া ঝুনা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাতে যেটুকু ক্ষতি হইয়াছে তাহা মনেরই হইয়াছে, স্মৃতিগুলির হয় নাই। তাহারা বরং কাঠিন্যের ছাঁচে পড়িয়া অপরিবর্তনীয় অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

আরও একটি কথা। সে বয়সে মনের মধ্যে অহংবুদ্ধির জট ভাল করিয়া পাকাইয়া উঠে নাই। আশপাশের জগতে যাহা কিছু ঘটে সকলের সঙ্গেই নিজেকে জড়াইয়া একটা অত্যন্ত অতৃপ্তিকর জটিলতা সৃষ্টি করিবার বাসনা তখনও মনকে পাইয়া বসে নাই। তখন মনটা ছিল একান্তভাবে দ্রষ্টার মন। কাজেই এই সব পুরাতন স্মৃতিব মধ্যে একটা অবিমিশ্র আত্ম-নিরপেক্ষতা আছে যাহা অন্য বয়সেব স্মৃতিব মধ্যে একান্ত দুর্লভ। দেখার আনন্দেই দেখিয়াছি, শোনার আনন্দেই শুনিয়াছি। বুঝিয়াছি হয়তো অনেক পরে। তখন মন ছিল ক্যামেরার প্লেট, এখন হইয়াছে শিল্পীর পট। অজ্ঞাতেই হয়তো এই সব স্বয়ংসম্পূর্ণ স্মৃতি-চিত্রগুলিতে নিজের 'মনের মাধুরী' মিশাইয়া ফেলিয়াছি, পরিণত বুদ্ধি ও কল্পনার রঙে সেগুলিকে রঙীন করিয়া তুলিয়াছি। (তথাপি সেগুলি আমার বর্তমান জীবনের প্রযোজন অপ্রয়োজনের নাগালের সম্পূর্ণ বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে, আমার আজিকার জীবনের হাসিকান্নার আবর্ত তাহাদের ঘেরিয়া রচিত হয় নাই। মাঝে মাঝে মনে হয় তাহারা যেন কোন স্বতন্ত্র জগতের বস্তু। কিন্তু স্বপ্নলোকের সুষমা তাহাদের থাকিলেও স্বপ্নলোকের অবাস্তবতা তাহাদের বিন্দুমাত্র নাই। আমার অন্তর্জীবনের দিক দিয়া তাহারা অতিমাত্রায় বাস্তব—অতিমাত্রায় সত্য। তাহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাদিগকে ভুলিতে পারি নাই, কখনো ভুলিতে পারিব না। যখন পিছনে ফিরিয়া চাই, তখন তাহারা

হাতছানি দিয়া ডাকে। নিশির ডাকে উদ্‌ভ্রান্ত ঘরছাড়া পথিকের মত মন ব্যাকুল হইয়া অতীতের সেই দিনগুলির দিকে ছুটিয়া যায়। নাড়ীর টান অগ্রাহ্য করিতে পারি না।)

যে কথা ভাবিতে ভালো লাগে সে কথা অপরকে শুনাইবার ইচ্ছা খুবই স্বাভাবিক। তথাপি বেশ খানিকটা সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি। ক্ষুদ্র একখানি গ্রামের কথা, অশিক্ষিত দরিদ্র কয়েকজন নরনারীর কথা সকলের হয়তো ভালো লাগিবে না। ভালো লাগিত যদি আমার শিল্প-সৃষ্টির ক্ষমতা থাকিত। কথার পর কথা গাঁথিয়া যদি আমি কাব্য রচনা করিতে পারিতাম, রঙের পর রঙ জুড়িয়া যদি ছবি আঁকিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়তো শিল্পরসিকের নিকট প্রশংসা অর্জন করিতে পাবিতাম। কিন্তু সে আমার সাধ্যের অতীত। আমি শুধু সত্যের আদ্‌রা আঁকিয়া যাইব। যদি কোথাও একটু আধটু রঙ লাগিয়া থাকে, তাহা স্মৃতির রঙ কবিকল্পনার রঙ নহে।

মানুষেব কথা, কোন মানুষেরই কি ভালো লাগিবে না?

গঞ্জটি বড়, কিন্তু গ্রামটি ছোট। পার্শ্ববর্তী প্রায় পনের-কুড়িখানা গ্রামের সমবেত কর্ম-প্রচেষ্টার ফলে আমাদের গ্রামের একপ্রান্তে নদীর ধারে এই গঞ্জটির উদ্ভব হইয়াছিল। সেখানে বড় বড় গুদাম ঘর ছিল, সারি সারি দোকান ছিল। ঘাটে-বাঁধা কিস্তি নৌকায় সারাদিন ধরিয়া মাল বোঝাই হইত। আমদানী রপ্তানী কেনাবেচার কোলাহলের মধ্যে বাণিজ্য-লক্ষ্মীর পদধ্বনি শুনা যাইত। তাহার উপর সপ্তাহে দুইদিন প্রকাণ্ড হাট বসিত। সেখানে যাহাদের মুখ দেখিতে পাইতাম তাহারা অনেকেই আমাদের গ্রামের লোক নহে—অনেককে চিনিতামই না। কাজেই এই বাজারগঞ্জ অঞ্চলটিকে আমরা গ্রামের অংশ বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত ছিলাম না। প্রত্যহ দুধ-মাছ তরি-তরকারি কিনিতে বাজারে যাইতে হয়, প্রয়োজনীয় জিনিস্-পত্র কিনিতে দোকানে যাইতে হয়, হাটবারে হাট করিতে যাইতে হয়,—গ্রামের লোকের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার সহিত বাজারের এইটুকুই সম্পর্ক ছিল। "বাজারে গিয়াছে" আর "গ্রামে নাই"—তাহাদের নিকট এই দুইটি কথা প্রায় সমার্থবোধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

গ্রামটি ছোট, শান্ত, কর্মচাঞ্চল্যহীন। সেখানকার জীবন-যাত্রার গতি ছিল অলস-মন্থর। দিনের পর দিন সেখানে মন্দাক্রান্তা ছন্দে আসিত ও যাইত। ব্যক্তিগত জীবনের বিস্ফোরণে মাঝে মাঝে তাহার প্রশান্তি ব্যাহত হইত বটে, কিন্তু ক্ষতচিহ্ন বেশীদিন স্থায়ী হইত না, গ্রাম-দেবতার সুস্নিগ্ধ করস্পর্শে শীঘ্রই মিলাইয়া যাইত। সমাজ-জীবনের সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল সব কিছু সহ্য করা, মানিয়া লওয়া, মানাইয়া লওয়া। সুখ ছিল কিনা জানি না, তবে শান্তি ছিল। এখনও যখন সেই ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার

দিনগুলির কথা ভাবি, তখন মনের উপর দিয়া যেন সেই পুরাতন শান্তির হাওয়া আবার একবার বহিয়া যায়।

এই শান্তির কারণ বোধ হয় ছিল মানুষের মাটির উপর নির্ভর। গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক স্থানীয় স্কুলে মাষ্টারি করিতেন, কয়েক জন গ্রামের জমিদারের সেরেস্তায় চাকুরি করিতেন, কয়েকজন ব্যবসায়ীর বাজারে দোকান ছিল। কিন্তু সকলেরই প্রধান অবলম্বন ছিল কৃষি। সকল পরিবর্তন ও উন্নতির মূলে আছে মানুষের অসন্তোষ ও বিদ্রোহ। কৃষিজীবী মানুষ সহজে বদলায়না, বদলাইতে চায় না। সে স্বল্পে সন্তুষ্ট, বিদ্রোহ তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। অনেক কিছু না হইলেও তাহার চলে। এই জন্যই বোধ হয় প্রসন্ন জীবন-দেবতা তাহাকে অঞ্জলি ভরিয়া শান্তি প্রদান করেন।

গ্রামটি কায়স্থ-প্রধান। তিন ঘর কায়স্থ জমিদারকে কেন্দ্র করিয়া তিনটি প্রধান পাড়া গড়িয়া উঠিয়াছে—তাঁহাদের পদবী অনুসারে পাড়া তিনটি ঘোষপাড়া, মিত্তিরপাড়া ও দত্তপাড়া নামে পরিচিত। ঘোষবাবুদের অবস্থা তখনই বেশ খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, অপর দুই পরিবারের তখনও দোর্দণ্ড প্রতাপ। মাঝের পাড়া অর্থাৎ মিত্তির পাড়ার গা ঘেঁসিয়া পূর্ব ও উত্তর দিকে বিরাট নমশূদ্র পল্লী। সকল পাড়াতেই কিছু কিছু ব্রাহ্মণের বাস ; সংখ্যায় তাঁহারাও নিতান্ত কম নহেন। তাহা ছাড়া কয়েক ঘর করিয়া জেলে, জোলা, কৈবর্ত, কলু, বৈশ্যসাহা, তাম্বুলি, গোয়ালা, কর্মকার, বৈরাগী, রজক ও নরসুন্দর গ্রামের সর্বত্র ছড়াইয়া বাস করিত। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে জেলা বোর্ডের বড় রাস্তার ধারে বিশ পঁচিশ ঘর 'বুনো' বা সর্দারের বসতি। ইহারা আদিতে বোধ হয় ছিল সাঁওতাল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর দেশ যখন জনশূন্য হইয়া যায়, চাষীর অভাবে জমি যাহাতে অনাবাদী হইয়া পড়িয়া না থাকে সেই উদ্দেশ্যে তদানীন্তন কালের জমিদারেরা ইহাদিগকে বাংলার বাহির হইতে লইয়া আসিয়া গ্রামে বসতি করাইয়া দিয়াছিলেন। কালক্রমে ইহারা গ্রামসমাজের অন্তর্ভুক্ত

হইয়া গিয়াছিল,—গ্রামবাসীদের আপনার জন হইয়া উঠিয়াছিল।

গ্রামের জনৈক বৈশ্যসাহা পাটের ব্যবসা করিয়া রাতারাতি খুব ফাঁপিয়া ওঠেন। তখন তিনি গ্রাম হইতে উঠিয়া গিয়া বাজারের উত্তরে বন কাটিয়া নূতন ভিটার পত্তন করেন এবং সেখানে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। শীঘ্রই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সেখানে একটি ছোট সাহা-পাড়া বা সৌ-পাড়া গড়িয়া উঠে। এই পাড়ার বাসিন্দারা ছিল সকলেই একান্তভাবে ব্যবসায়ী,—কেহই কৃষিকর্মের ধার ধারিত না! এই জন্য গ্রামের স্বাভাবিক জীবনধারা হইতে ইহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রামের একেবারে পূর্ব প্রান্তে মরাগাঙের ধারে তিনখানি দোচালা কুঁড়ে ঘরের বাড়ীতে বাস করিত কালু মিঞা, গ্রামের একমাত্র মুসলমান বাসিন্দা।

গ্রামের পশ্চিম ও উত্তর পার্শ্ব দিয়া একটি নদী বক্রগতিতে অর্ধচন্দ্র রচনা করিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। গর্ভিনী হরিণীর ন্যায় মন্থর তাহার গতি, শরতের সন্ধ্যার আকাশের ন্যায় নির্মল নীলাভ তাহার জল। দুই তীরে সুপারি, খেজুর ও নারিকেলের শ্রেণী। কোথাও বা একটা শিমুল গাছ তাহার কণ্টকিত দেহ উদ্ধত বক্তিম পুষ্পে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও বাঁশঝাড়ের মাথা আসিয়া প্রায় জলের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে দুই একখানি ধানের ক্ষেত। নদীটির মধ্যে পুরুষালি ভাব কোথাও নাই; সে যেন গ্রামের অন্তঃপুরচারিণীদেরই। একজন প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্নে গ্রামবধূরা খিড়কির দরজা খুলিয়া বাসনের বোঝা লইয়া নদীর ঘাটে আসিয়া বসে; মধ্যাহ্নে বালকবালিকার দল জলে পড়িয়া নির্ভয়ে দাপাদাপি করে। সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার বুকের উপর গৃহস্থদের পোষা হাঁস সাঁতার দিয়া বেড়ায়; তীরে তীরে কাদাখোঁচা পাখি লেজ নাচাইয়া ঘোরে; শঙ্খচিল ও মাছরাঙার দল আকাশে উড়িয়া উড়িয়া শিকারের সন্ধানে ফেরে। নদী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে যেন

একটা নিশ্চিন্ত মিতালির সম্বন্ধ রহিয়াছে। পরস্পরের প্রতি যেমন একটা মৃদু ঔদাসীন্যের ভাব আছে তেমনি পরস্পরের উপর নির্ভয় নির্ভরও আছে।

নদীটি স্বচ্ছতোয়া বটে, কিন্তু স্বল্পতোয়া নহে। ইহারই উপর দিয়া গঞ্জের পণ্য বহন করিয়া ভারী ভারী কিস্তি ও বজরা যাতায়াত করে। প্রতিদিন ভোরবেলা একখানি ছোট্ট ষ্টীমার সুদূর শহর হইতে আসিয়া ইহারই ঘাটে নোঙর ফেলে, দীর্ঘচ্ছন্দের শৃঙ্গধ্বনিতে মুহূর্তের জন্য সদ্য-জাগরিত গ্রামখানিকে উচ্চকিত করিয়া তোলে। তাহার পর তন্দ্রাচ্ছন্ন গ্রাম-জীবনের ছোঁয়াচ লাগিয়াই যেন সমস্ত দিন ঘাটে পড়িয়া ঝিমাইতে থাকে; সন্ধ্যার পর আবার শৃঙ্গধ্বনি করিয়া বাহিরের পৃথিবীর দিকে চলিয়া যায়। বর্ষাকালে নদীর শ্যামল জলে গেরুয়ার ঈষৎ আভাস দেখা দেয়, দুই এক বৎসর কূল-প্লাবনের কাহিনীও শোনা যায়।

এই মন্থর-ধারা নদীর স্রোতের সহিত গ্রামের জীবনস্রোত নিবিড়ভাবে জড়াইয়া গিয়া এক বিচিত্র যুক্তবেণী রচনা করিয়াছিল। নদী বাদ দিয়া গ্রামের কথা কেহ চিন্তা করিতেও পারিত না। একদিকে মাঠ, একদিকে নদী। মাঠে গড়িয়া উঠিত খাদ্যের ভাণ্ডার, নদী জোগাইত রসের প্রবাহ; মাঠে ছিল জীবিকা, নদীতে ছিল বিশ্রাম; মাঠে বাজিত লক্ষ্মীর নূপুর ও বৈরাগীর একতারা, নদীতে বাজিত অবিচ্ছিন্ন প্রশান্তির রাখালিয়া বাঁশী।

গ্রামের নাম ধানসোনা, নদীর নাম নীলা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কথা বলিতেছি। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর উদ্যোগ ও সাধনার ফলে তখন বাংলাদেশে নব-সভ্যতার প্লাবন আসিয়াছে; জনগণের মনে ও জীবনে ইংরাজি শিক্ষা অপর্যাপ্তরূপে ফলপ্রসূ হইয়া উঠিয়াছে। দেশ জুড়িয়া পুরাতন বর্জন ও নূতনের আবাহন শুরু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে

আমাদের গ্রামের জীবনে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন তখনও সাধিত হয় নাই। একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় অবশ্য গ্রামে বহুদিন পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই স্কুল হইতে বৎসরের পর বৎসর অনেকগুলি করিয়া ছাত্র পাশও করিত। তাহাদের মধ্যে অনেকে তাহার পর সহরে গিয়া উচ্চশিক্ষা ও নবসংস্কৃতিতে দীক্ষা দুই-ই লাভ করিত। কিন্তু তাহারা কেহ গ্রামে বাস করিত না—চাকুরির সন্ধানে কন্যাকুমারী হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িত। শুনিয়াছি এই গ্রামেরই ছেলে সুদূর নেটিভ ষ্টেটের দেওয়ান হইয়াছে, লাহোরে সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়াছে, মাদ্রাজের কলেজে গিয়া অধ্যাপক হইয়াছে, রায়-বেরিলীতে ওকালতি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছে। কিন্তু তাহারা গ্রামজননীর ক্রোড় হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে,—শিক্ষায়-দীক্ষায় আচারে ব্যবহারে একেবার বিদেশী বনিয়া গিয়াছে।

পূজার সময় দিন পনেরর জন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশে ফিরিতেন, যেমন কলিকাতার লোক ছুটি পাইলে মধুপুর গিরিডি বা পুরী দার্জিলিং যায়। কয়েকদিনের জন্য জুতাজামার চাকচিক্যে ও শাড়ী গহনার সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে গ্রামের লোকের চোখ ধাঁধিয়া যাইত,—চপল-ভাষণ ও উচ্ছল উচ্চহাস্যের প্রতিধ্বনিতে গ্রামের পথঘাট মুখরিত হইয়া উঠিত। বাজারে দুধের সের চার পয়সা হইতে ছয় আনায় উঠিত, দুই আনার মাছ বারো আনায় বিকাইত। প্রিয়জন-সম্মিলন ও বর্ধিত দ্রব্যমূল্যের দোটানায় পড়িয়া গ্রামবাসীদের সে এক বিচিত্র 'হরিষে বিষাদ' উপস্থিত হইত। 'বিজয়া সম্মেলন' হইত, 'পূর্ণিমা সম্মেলন' হইত,—নবাগতদের মুখে রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য সম্বন্ধে বড় বড় কথা শুনিয়া সকলে থ' হইয়া যাইত,—মনে মনে যে একটু গৌরব অনুভব করিত না এমন নহে। বাহিরের জগৎ হইতে যেন একটা ঘূর্ণী হাওয়া আসিয়া দিন কয়েকের জন্য সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিত। বেশ মনে পড়ে,

এমনি কোন এক পূজার ছুটিতে একটি অবিবাহিত কিশোরীর পায়ে জরির কাজ করা সবুজ ভেলভেটের নাগরা জুতা দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম।

কিন্তু ইঁহারা ছিলেন দু'দিনের অতিথি মাত্র। যে চলিষ্ণু প্রবহমান জীবনের বার্তা ইঁহারা সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেন ইঁহাদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা পুনরায় গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। ইঁহারা মাত্র একটা সাময়িক আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারিতেন, স্থায়ী প্রভাব কিছু রাখিয়া যাইতে পারিতেন না। নব-সভ্যতার স্রোত দেশের উপর দিয়া খরধারায় প্রবাহিত হইতেছিল, ক্ষুদ্র শান্ত পল্লীর বুকে তাহার সংঘাতে দুই একটি ছোট তরঙ্গ উঠিত মাত্র। তাহার পর আবার সব আলোড়ন মিলাইয়া যাইত, গ্রামের জীবন আবার ঝিমাইয়া পড়িত। মাঠ হইতে নদী, নদী হইতে মাঠ—আবার সেই পুরাতন পথ ধরিয়া মৃদু-মন্থর কর্মচক্র আবর্তিত হইতে থাকিত। যাহারা পর হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে পর বলিয়া ভাবিতে হয়তো মনের কোণে একটু বেদনা বাজিত, কিন্তু সে বেদনা নীরবেই সহ্য করিতে হইত।

৩

প্রকাণ্ড উঁচু দাওয়ার উপর ছোট্ট একখানি কুঁড়ে ঘর। চারিদিকে মাটি-লেপা ছেঁচাবেড়ার দেয়াল, উপরে উলু খড়ের ছাউনি। সামনে আরও ছোট্ট একটুখানি বারান্দা। ভিটার চারিদিকে বড় বড় গাছ—আম, জাম, গাব, নারিকেল, ছাতিম, আঁশ-ফল। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ছায়াচ্ছন্ন উঠানখানিতে সন্ধ্যায় আঁধার ঘনাইয়া আসে। উঠানের অপর প্রান্তে একটি পোড়ো ভিটার উপর বন-হলুদ, কাঁটানটে ও আশ্‌শেওড়ার জঙ্গল। বোধ হয় এককালে সেখানে রান্নাঘর বা ঢেঁকিশাল ছিল। উঠানের বাঁ দিকে প্রকাণ্ড একখানা মাটির দেয়ালের পাঁচ-চালা ঘর সংস্কারের অভাবে ধীরে ধীরে জীর্ণ হইয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। এক কোণের দেয়ালে একটা মস্ত বড় গর্ত, চালের অর্ধাংশ পচিয়া খসিয়া পড়িয়াছে, বাকি অর্ধেকেরও খড় ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দরজার বাহিরে শিকল লাগানো, তাহা হইতে প্রকাণ্ড একটা মরিচা-পড়া তালা ঝুলিতেছে। উঠানের সর্বত্র বড় বড় ঘাস গজাইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া একটা সরু পায়ে-চলা পথ কোনাকুনি মিত্তিরপাড়া হইতে নমশূদ্রপাড়ার দিকে চলিয়া গিয়াছে।

এই বাড়ীর একমাত্র বাসিন্দা ছিলেন বৃদ্ধা ভীম ঠাকুরের মা। গ্রামে কেহই তাঁহার নাম জানিত না,—তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিবার মত কেহ তখন বাঁচিয়াও ছিল না। কারণ যখনকার কথা বলিতেছি তখন তাঁহার বয়স প্রায় নব্বুই-এর কাছাকাছি। কোমর ভাঙিয়া গিয়াছিল; তাহা সত্ত্বেও লাঠিতে ভর দিয়া ঠুক্ ঠুক্ করিয়া যখন এপাড়া ওপাড়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন তখন তাঁহার দেহের ঊর্ধ্বাংশ পায়ের তলার মাটির সহিত ঠিক সমান্তরাল রচনা করিয়া রহিত। এত বয়সেও যে মানুষ এমন শক্ত থাকিতে পারে একালের লোকের পক্ষে তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব।

ভীম ঠাকুরের মাকে ধানসোনা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই চিনিত, মান্য করিত, ভালোবাসিত। গ্রামের বৌ-ঝিরা তাঁহার কাছে জলপড়া, তেলপড়া ও টোট্‌কা ঔষধপত্রের জন্য আসিত, আর আমরা শিশুর দল আসিতাম রূপকথা শুনিবার লোভে। মাথার শাদা চুল পুরুষ মানুষের মত ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা; গায়ের চামড়া শ্লথ হইয়া ভাঁজে ভাঁজে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; মুখের সহস্র কুঞ্চন-রেখার মধ্যে হাসি-কান্নার পার্থক্য পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে;—এই ন্যুব্জদেহ কুৎসিতদর্শনা বৃদ্ধার মধ্যে আমরা এক মমতাময়ী সখীর সন্ধান পাইতাম। মুখের কথা দিয়া আমাদের শিশুমনের মধ্যে তিনি স্বপ্নের ইন্দ্রজাল বুনিতে পারিতেন।—জোছ্‌নায় ফিনিক্ ফুটিত; তেপান্তরের মাঠের ওপারে হুড়ুমশিমার গাছের ডালে বসিয়া ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী মানুষের ভাগ্য লইয়া হেঁয়ালি রচনা করিত; পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া রাজপুত্তুর স্বপ্নে দেখা রাজকন্যার সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতেন; দুই পাশে জীয়ন-কাঠি মরণ-কাঠি লইয়া নিঝুমপুরীর রহস্যময়ী সুন্দরী মায়ানিদ্রায় সুষুপ্ত হইয়া রহিতেন; অজগরের মাথার উপর সাত রাজার ধন এক মানিক—তাহার আলোয় অন্ধকার বনভূমি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত; আর মাঝে মাঝে দিগন্ত আঁধার করিয়া কালবৈশাখীর মেঘের মত ভীমদর্শন রাক্ষসের পাল হাঁউ-মাউ-খাঁউ শব্দে ছুটিয়া আসিত। আতঙ্কে বিস্ময়ে আনন্দে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিত। তাহার পর কত গল্পই শুনিলাম, কত গল্পই পড়িলাম। কিন্তু আমাদের দিদিবুড়ীর মত পাকা আর্টিষ্ট আর কখনও দেখিতে পাইলাম না।

আমরা ছোটর দল তাঁহাকে দিদিবুড়ী বলিয়া ডাকিতাম। বিশেষ করিয়া আমার সহিত তাঁহার সম্বন্ধটা একটু বেশী ঘনিষ্ঠ ছিল। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা দুপুরের মজলিশে রূপকথা শুনিয়াই ঘরে ফিরিত, আমি কিন্তু গল্প-শোনার দক্ষিণা না লইয়া ফিরিতাম না। তাঁহার বৈকালিক জলযোগের একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে আমার

প্রাত্যহিক অধিকারের দাবী তিনি সানন্দে মানিয়া লইয়াছিলেন একদলা দুধের কড়াইয়ের চাঁছি, একখণ্ড মিছরি, কয়েক টুকরা কলা ব শশা, শাঁক-আলু, বা তালের আঁটির শাঁস, একটু আমসত্ত্ব ব নারিকেল কোরা, কয়েক দানা মুগের অঙ্কুর বা ভিজা ছোলা—যেদিন যাহা জুটিত তাহাই এমন অমৃত-মধুর বলিয়া মনে হইত যে তাহার তুলনায় নিজের গৃহের সমস্ত আয়োজন একেবারে তুচ্ছ হইয়া যাইত বোধ হয় মানুষটির আপন মনের মাধুর্যই এই সব সামান্য খাদ্যকে এত মধুর করিয়া তুলিত। যাহা খাইতাম তাহার অনেক বেশী পাইতাম।

অধিকাংশ পল্লীবৃদ্ধাই দেখিতাম পরচর্চায়, বিশেষতঃ পরনিন্দায়, অপরিসীম আনন্দ পাইতেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া দুইজনের কথা মনে পড়িতেছে। প্রত্যহ বেলা ঠিক দশটার সময় ইঁহারা দুইজনে শিরোমণি মহাশয়ের পুকুরে স্নান করিতে আসিতেন এবং স্নানান্তে বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ির দুই প্রান্তে দুই বোঝা ফুল বেল-পাতা লইয়া শিবপূজা করিতে বসিতেন। এই পূজা তাঁহাদের সাঙ্গ হইত বেলা তিনটায়। কারণ, মন্ত্রপাঠ, জপ, ও ধ্যান ইত্যাদি সমাপন করিতে তাঁহাদের যতটা সময় লাগিত তাহার তিনগুণ সময় লাগিত সমগ্র গ্রামের নরনারীর গোপন ও প্রকাশ্য দোষগুণের দৈনন্দিন সমালোচনায়। 'দোষগুণ' বলিলাম বটে, কিন্তু পরের গুণ তাঁহাদের নজরে খুব কমই পড়িত ; উড়ন্ত মাছির মত তাঁহাদের মন অপরের দোষ-ত্রুটি গ্লানি-কুৎসার দূষিত ক্ষতের উপরেই নিরন্তর ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিতে থাকিত। এমন অপরূপ পূজা আর কখনও দেখি নাই। নেহাৎ শিবের মত সর্বংসহ দেবতা তাই রক্ষা ' অন্য কোন দেবতা হইলে কোন্ কালে পূজারিণীদের মুণ্ডপাত করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিতেন। পুকুরে স্নান করিতে গেলে প্রায়ই তাঁহাদের এই মক্ষিকা-গুঞ্জন শুনিতে হইত ; মনে হইত

যেন অবগাহন সত্ত্বেও গায়ে খানিকটা দুর্গন্ধ পাঁক মাখিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

আমাদের দিদিবুড়ী কিন্তু কোনদিন এইসব মুখরোচক পরচর্চার মজলিশে যোগ দিতেন না। তাঁহার অসাধারণ বাক্‌পটুতা মাত্র ছোটদের আসরেই সীমাবদ্ধ থাকিত; বড়রা তাঁহাকে অতিমাত্রায় স্বল্পভাষিণী বলিয়াই জানিত। তাঁহার কাছে মধু পাইয়াছি প্রচুর, কিন্তু হুল ফুটাইতে তাঁহাকে কোন দিন দেখি নাই। সুপক্ক ফজলি আমের শাঁসের মত ছিল তাঁহার স্বভাবটি,—একগাছি আঁশ বা একফোঁটা অম্লরসের ভেজাল তাহাতে ছিল না।

দেখিয়া মনে হইত বুড়ীর বুঝি তিন কুলে কেহ নাই। কিন্তু একথা সত্য নহে। বুড়ীর একমাত্র পুত্র ভীমচন্দ্র তখনও জীবিত। সে কোথায় আছে বা কি করিতেছে তাহা কেহ জানিত না বটে, কিন্তু গ্রামের সকলেই জানিত যে সে বাঁচিয়া আছে। কেমন করিয়া জানিত তাহা আজিও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে দুই একজনকে বলাবলি করিতে শুনিতাম—মরিলে নিশ্চয় খবর আসিত; সে খবর যখন গ্রামে আসিয়া পৌঁছায় নাই তখন সে নিশ্চয় বাঁচিয়া আছে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে দিদিবুড়ী যখন বিধবা হন, তখন ভীমের বয়স কুড়ি বাইশ হইবে। সেই বয়সেই সে নানাবিধ নেশায় বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিল, চরিত্রদোষের কথাও শুনা যাইত। দিদিবুড়ীর স্বামী পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী ছিলেন, কয়েকঘর বেশ শাঁসালো যজমান ছিল। একমাত্র পুত্রের প্রতি অন্ধ স্নেহের বশবর্তী হইয়া তিনি তাহাকে চাহিবামাত্রই পয়সা জোগাইয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দিদিবুড়ী একেবারে হাত গুটাইয়া ফেলিলেন। ভীমচন্দ্র প্রথমে অনুনয়-বিনয় করিল, তাহার পর কান্নাকাটি করিল, তাহার পর ঝগড়া করিল, ভয় দেখাইল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,—দিদিবুড়ী সাফ্ বলিয়া দিলেন, গাঁজাগুলি খাইবার পয়সা তিনি দিবেন না। তাহার পর হঠাৎ একদিন সকালে দেখা গেল বড় শয়নঘরের দরজায় কুলুপ ঝুলিতেছে, ভীমচন্দ্র নিরুদ্দেশ। খোঁজ লইয়া জানা গেল হরিশ রক্ষিতের বিধবা যুবতী ভগ্নী কামিনীও তাহার সহিত নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার পর এত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শুনা যায় ইহার মধ্যে ভীম তাহার মাতার নিকট দুইখানি পত্র দিয়াছিল—একবার কলিকাতার বাগবাজার হইতে ও একবার গৌহাটির পানবাজার হইতে। দুইখানি পত্রেই সে মাতার নিকট একই বস্তু প্রার্থনা করিয়াছিল—তাঁহার স্নেহাশীর্বাদ ও কিঞ্চিৎ অর্থ। দিদিবুড়ী একখানি পত্রেরও জবাব দেন নাই। তাহার পর গ্রামের লোক কোনদিন তাঁহাকে পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতেও শুনে নাই।

দিদিবুড়ীর স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার যজমানেরা অন্য পুরোহিতের শরণাপন্ন হইল, ভীমচন্দ্রকে পৌরোহিত্যে বরণ করিবার চিন্তাও তাহাদের মনে উদিত হইল না। কয়েক মাসের মধ্যে ভীমচন্দ্রও নিজের পথ দেখিল। বিধবা একান্ত নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন। স্বামী মৃত্যুকালে তাঁহার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় তের কুড়ি টাকা একটি পিতলের ঘটির মধ্যে রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই অর্থই এখন দিদিবুড়ীর একমাত্র সম্বল হইয়া দাঁড়াইল। জীবিকা-নির্বাহের জন্য তিনি যে বৃত্তি অবলম্বন করিলেন তাহা একমাত্র সেই প্রাচীন গ্রামসমাজেই সম্ভব ছিল; এখনকার লোকের কাছে তাহা একান্ত অবিশ্বাস্য, এমন কি হাস্যকর বলিয়াও মনে হইতে পারে। এই তের কুড়ি টাকার সামান্য কিছু হাতে রাখিয়া বাকি সমস্ত তিনি 'লাগাইয়া দিলেন' অর্থাৎ সুদে খাটাইতে শুরু করিলেন। তাঁহার খাতকেরা সকলেই ছিল দরিদ্র কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের লোক। দলিল পত্রের বালাই ছিল না, সবই মুখের কথার উপর নির্ভর করিত।

জীবনে কোনদিন আসল টাকার জন্য তাগাদা করিবেন না এইরূপ একটা অকথিত সর্ত্তই ছিল তাঁহার ঋণদানের বিশেষত্ব; লগ্নী টাকার একটি পয়সাও তিনি কোনদিন ফেরৎ চান নাই বা পান নাই। স্থদ আদায়ের পদ্ধতিও ছিল একটু বিচিত্র ধরণের। পয়সা তিনি লইতেন না; তাহার পরিবর্তে খাতকদের কেহ দিত চাল, কেহ দিত ডাল, কেহ বা ক্ষেতের তরিতরকারি বা গাছের ফলটা পাকড়টা দিয়াই খালাস পাইত। বিদ্যাধর জোলা দিত বছরে তিনখানা থান কাপড় ও একখানা গামছা; তিনু কলুর বৌ দিত আড়াই সের বড়ি ও মাসে আধসের করিয়া সরিষার তেল। দিদিবুড়ী নেশা হিসাবে দন্তহীন মাড়িতে তামাকের গুঁড়া ব্যবহার করিতেন। নমশূদ্র পাড়ার অম্বার মা প্রতি বুধবার বৈকালে আসিয়া এক কৌটা করিয়া গুঁড়া দিয়া যাইত,—তাহার স্থদ সে এইরূপ ভাবেই শোধ করিত। কিন্তু যে যাহাই দিত তাহাই একটা নিয়মিত বরাদ্দ হিসাবে দিতে হইত, ফেলিয়া রাখিলে চলিত না। খাতকেরাও বরং জমিদারের খাজনা ফেলিয়া রাখিত, কিন্তু তাহাদের কর্তামার প্রাপ্য দেয় নাই বা দিতে দেরী করিয়াছে এমন কথা কোনদিন শুনি নাই। দিদিবুড়ী খুব রাশভারী মেয়েমানুষ ছিলেন। তাহারা তাঁহাকে যেমন ভক্তি করিত, তেমনি ভয়ও করিত।

সমস্ত ব্যাপারটা আজ ভাবিতে গেলে কেমন ছেলেখেলার মত মনে হয়। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে এমনি ছেলেখেলার মধ্য দিয়াই এই সহায়-সম্বলহীনা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-বিধবা স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন, স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দিদিবুড়ী বহুবার নিজের মুখে আমাদের কাছে বলিয়াছেন যে তাঁহার কোন অভাব নাই।

সত্যই তাঁহার কোন অভাব ছিল না। মনের মধ্যে অফুরন্ত প্রশান্তি ও প্রসন্নতার ভাণ্ডার লইয়া তিনি তাঁহার ভাঙা কুঁড়েয় দিনযাপন করিতেন। পরের করুণা তিনি কোন দিন ভিক্ষা করেন

নাই, বরং সকলের নিকট হইতে নিজের ব্যক্তিত্বের দাবীতে প্রচুর পরিমাণে শ্রদ্ধা ও সম্মানই পাইয়া গিয়াছেন। তথাকথিত শিক্ষা দীক্ষার ধার তিনি ধারিতেন না; লিখিয়া নাম সই করিবার প্রয়োজন যে জীবনে কখনও হইতে পারে সে বোধটুকুও তাঁহার ছিল না। কিন্তু বুদ্ধির দিক দিয়াই হউক বা মনুষ্যত্বের দিক দিয়াই হউক তাঁহাকে খাটো করিয়া দেখিবার সাধ্য গ্রামের কাহারও ছিল না।

কোনদিন হয়তো দেখিয়াছি গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের মধ্যে ঠিক-দুপুর বেলা দিদিবুড়ী লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করিতে করিতে চলিয়াছেন। অকারণ কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি,—এমন সময় কোথায় যাচ্ছো দিদিবুড়ী ?

—জীবন মালোর বাড়ী যাচ্ছি ভাই, এট্টু দরকার আছে।

—খাতক বুঝি ?

—হ্যাঁ ভাই, বড়ো গরীব। খবর পেলাম আজ সাতদিন জ্বরে পড়ে আছে,—জালে বেরুতি পারে না। ডাক্তার কব্‌রেজ ডাকবার তো সাধ্যি নেই। এক ফোঁটা ওষুধও পেটে পড়ছে না। তাই ভাবলাম, যাই একবার দেখি যদি জড়িবুড়ী জলপড়া-তেলপড়ায় কোন উব্‌গার হয়। হয়ও তো অনেকের উব্‌গার কি না!

—হাতের পুঁটুলিতে কি নিয়ে যাচ্ছো ?

—ওতে চাট্টিখানি সাবুদানা আছে। শ্যামচাঁদ বৈরিগি বাজারে নতুন দোকান খুলেছে,—সেই দিইছিল আমারে। তা আমি ভালো মানুষ সাবুদানা খেতি যাবো কোন দুঃখে ভাই ? তাই নিয়ে যাচ্ছি হাতে করে,—গরীব মানুষ, পথ্যি করবে।

রৌদ্রের উত্তাপে ঘামিতে ঘামিতে ভাঙা কোমরে লাঠি ভর দিয়া নব্বুই বৎসরের বৃদ্ধা চলিলেন সে-ই নদীর ধারে জীবন মালোর বাড়ী—পাকা আধক্রোশ পথ।

এমন প্রায়ই হইত। কৈলাশ বাছাড়ের নবজাত নাতিটি তড়কায়

যায় যায় হইয়াছে, বুড়া বৈষ্ণব সর্দারের হাঁপানি হঠাৎ খুব বাড়িয়া গিয়াছে, বিপিন মণ্ডলের পায়ের গুলের ঘা কে 'বাণ' মারিয়া বিষাইয়া দিয়াছে,—অমনি দিদিবুড়ী তাঁহার টোট্‌কা ঔষধ ও ঝাড়ানো-পড়ানোর পুঁজি লইয়া ছুটিলেন চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে। শুধু ইহাই নহে। বাকি খাজনার দায়ে খাতকের জমি নিলাম হইতে বসিয়াছে,—দিদিবুড়ী চলিলেন জমিদার বাড়ী তাহার হইয়া সুপারিশ করিতে। খাতকে খাতকে বিবাদ করিয়া মামলা বাধাইবার উপক্রম করিয়াছে,—দিদিবুড়ী সালিশ হইয়া ঝগড়া মিটাইয়া দিলেন। খাতকের বৌ স্বামীর সঙ্গে বচসা করিয়া বাপের বাড়ী পলাইয়া গিয়াছে,—দিদিবুড়ী তাহাকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া সুঝাইয়া আবার ফিরাইয়া আনিলেন। সংসার বলিতে তাঁহার নিজের কিছুই ছিল না। কিন্তু এই খাতকদের লইয়াই তিনি এক বিরাট সংসার ফাঁদিয়া বসিয়াছিলেন। তাহাদের সকলেরই তিনি ছিলেন 'কর্তামা'। তাহাদের জন্য তাঁহাকে কম ভুগিতে হইত না,—অনেক হাঙ্গামা পোহাইতে হইত, অনেক ছুটাছুটি করিতে হইত। কিন্তু তিনি হাসি-মুখে সব সহ্য করিতেন। প্রতিদানে পাইতেন মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান আর কয়েকজন দরিদ্র নিরক্ষর নরনারীর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি।

একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। আমার জেঠতুত দাদা তখন বি-এ পরীক্ষা দিবার পর কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিয়াছেন। তাঁহার সহিত সকাল বেলা পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। যখন ঘরে ফিরিতেছি তখন বেলা আন্দাজ এগারটা হইবে। পথে কৃষ্ণ সর্দার অর্থাৎ কেষ্টা বুনোর সহিত দেখা হইল। হাতে একটি খালি ঘটি লইয়া সে মিত্তির পাড়ার দিক হইতে সর্দার পাড়ার দিকে যাইতেছিল। দাদাকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া বলিল,—পেন্নাম হই, দাদাঠাকুর। কোলকেতা থেকে দেশে ফেরলেন কবে? শরীর গতিক বেশ ভালো আছেন তো?

দাদা জবাব দিলেন,—হ্যাঁ, বেশ ভালোই আছি। তোমরা সব ভালো তো?—তা, এত বেলায় এদিকে কোথায় গিয়েছিলে?

—কত্তামার দুধটুকু দিয়ে এ্যালাম। এট্টু বেশী বেলা হয়ে গেছে আজ।

—দিদিবুড়ী কি তোমার কাছ থেকে দুধ জোগান নেন নাকি, কেষ্ট?

—আজ্ঞে না দাদাঠাকুর, সুদির দুধ।

মাত্র চার বৎসর কলিকাতা প্রবাসের ফলেই দাদা আধা-বিদেশী হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কি? সুদের দুধ? কিসের সুদ?

—আজ্ঞে, কত্তামার খাতক কিনা আমি। তাই সুদির বাবদ রোজ দেড়পো করে দুধ দিতি হয়।

দাদা ছিলেন অর্থনীতির ছাত্র। চশমার ভিতরে চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন,—রোজ দেড়পো করে দুধ দিতে হয় সুদ বাবদ! কত টাকা ধার নিয়েছিলে তুমি?

—আজ্ঞে, সে অনেক টাকা, তিন কুড়ি।

—কতদিন আগে ধার নিয়েছিলে?

—তা পেরায় এক কুড়ি পাঁচ বছর হতি গেলো।

—এই পঁচিশ বছর ধরে তুমি রোজ দেড়পো করে দুধ দিচ্ছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা দিচ্ছি বই কি?

দাদা মনে মনে আঁক কষিতে শুরু করিলেন,—রোজ দেড়পো করে হলে মাসে দাঁড়ালো গিয়ে পঁয়তাল্লিশ পো, মানে সওয়া এগার সের, আর বছরে হলো গিয়ে তোমার—এই একশো পঁয়ত্রিশ সের, মানে তিন মন পনের সের। চার পয়সা করে সের ধরলেও তার দাম প্রায় সাড়ে আট টাকা। ষাট টাকায় যদি সাড়ে আট টাকা হয়, তাহলে—ফোর্টিন পারসেণ্ট। উঃ! এ যে দস্তুর মত শোষণ!

কেষ্ট জীবনে কোনদিন 'শোষণ' কথাটি শোনে নাই। কাজেই ক্যাল ক্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। দাদা মনের আবেগে বলিতে লাগিলেন,—জানো কেষ্ট, তোমার ওপর কি অমানুষিক অত্যাচার করা হচ্ছে ? দিদিবুড়ী তোমার কাছ থেকে শতকরা চোদ্দ টাকা হারে সুদ আদায় করে নিচ্ছেন। এ যে কাবুলিওয়ালারও অধম! ষাট টাকা আসলের ওপর তুমি এই পঁচিশ বছরে দু'শো টাকারও বেশী সুদ দিয়েছ। এ যে কল্পনা করাও যায় না? এরকম অত্যাচার তোমরা সহ্য কর কেমন করে?

'শোষণ' না বুঝিতে পারিলেও 'অত্যাচার' কাহাকে বলে কেষ্টর তাহা অজানা ছিল না। অত্যন্ত বিব্রত ভাবে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উত্তর দিল,—কি যে বলেন দাদাঠাকুর! এর মধ্যি আপনি অত্যেচারটা দ্যাখ্‌লেন কোন্‌খানে? তিনকুড়ি টাকা কি কম হলো? মা তখনো বেঁচে আছেন; বললেন,—কেষ্ট, বেটার বৌ ঘরে আনছি, কুটুম-সাক্ষেতের পাতে দু'টো মাছ-ভাত না দিতি পারলি তো বড়ো নিন্দে হবে। ভেবে দ্যাখ্‌লাম, কথাটা ঠিক। তা টাকা পাই কোথায়? এ্যালাম কত্তামার কাছে। নেকা নেই পড়া নেই এক কথায় তিনকুড়ি টাকা আমারে দিয়ে দিলেন। কত বড়ো উব্‌গারটা করলেন আমার, ভেবে দ্যাখেন তো! ঐ তিনকুড়ি টাকার জন্যি সেদিন তো আমার একটা ভালো গাই কি বলদ বেচে ফেলতি হতো! আর একবার বেচলি কি আর কোনদিন কিনতি পারতাম? তাবপর আরো দ্যাখেন, এত বছর হয়ে গ্যালো, কত্তামা আসলের জন্যি কোন দিন একটা তাগাদা পর্যন্ত করেন নি। ও টাকা কোনদিন আমার দিতিও হবে না। পাঁচ গেরামের মধ্যি এমন মহাজন কোথায় আছে দাদাঠাকুর, যে এতদিন তার আসল ফেলে রাখে? এরে আপনি অত্যেচার বলেন?

কেষ্টর বক্তৃতা শুনিয়া দাদা কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া

পড়িলেন। আমতা আমতা করিয়া কহিলেন,—কিন্তু রোজ দেড়পো করে দুধ,—ফোর্টিন পারসেন্ট,—মানে সুদের হার বড় বেশী বলে মনে হয়, কেষ্ট!

কেষ্ট একটু হাসিয়া বলিল,—দুধির কথা বলছেন, দাদাঠাকুর? তা আপনাদের পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদে দুধির তো আমার অভাব নেই। কাচ্চাবাচ্চাগুলো পেট পুরে দুধভাত খায়; এপাড়ায় ওপাড়ায় দুই এক সের রোজ বেচতিও পারি। আমার ঘরের গাই-এর দুধ, তার এট্টুখানি যদি বিধবা বামুন-কন্যের হবিষ্যি ভোগে লাগে সেতো আমার চোদ্দপুরুষির ভাগ্যি, দাদাঠাকুর। অত্যেচারের কথা বলে আর আমারে অপরাধী করবেন না।

কেষ্ট আবার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। দাদাও বিরস-বদনে বিড় বিড় করিতে করিতে পথ চলিতে শুরু করিলেন। বোধ হয়, যাহারা নিজের ভালো চায় না তাহাদের ভালো করিবার চেষ্টা করা যে কতবড় ঝকমারি মনে মনে তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এই কেষ্ট সর্দারকে আমরা প্রায় রোজই দেখিতাম। কিন্তু দিদিবুড়ীর মৃত্যুর দিন তাহার যে মূর্তি দেখিয়াছিলাম তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

সেদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াই শুনিলাম দিদিবুড়ীর অবস্থা খারাপ। কয়েক দিন হইতে একটু সর্দি-কাসিতে ভুগিতেছিলেন, হঠাৎ শেষ রাত্রি হইতে খুব বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িয়াছে। অন্তার মা দুই দিন হইল রাত্রে আসিয়া বারান্দায় শুইতেছিল, তাহার নিকট সংবাদ পাইয়া মা রাত্রি থাকিতেই সেখানে চলিয়া গিয়াছেন। আমিও চোখ মুছিতে মুছিতে ছুটিলাম।

তখন বেশ রৌদ্র উঠিয়া গিয়াছে। দিদিবুড়ীর বাড়ী গিয়া দেখিলাম ইহার মধ্যেই সেখানে বহুলোক আসিয়া জড়ো হইয়াছে। দত্তবাড়ীর সদর নায়েব শ্রীকান্তবাবু আসিয়াছেন, ঘোষবাড়ীর সেজ

কর্তা আসিয়াছেন, মিত্তিরবাড়ীর তো মেয়েপুরুষ প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। পাড়ার কেহই আসিতে বাকি নাই, অন্যান্য পাড়া হইতেও অনেকে আসিয়া পড়িয়াছেন। শিরোমণি মহাশয় নিজেই একটি পিতলের ঘটিতে করিয়া গঙ্গাজল লইয়া আসিয়াছেন। দিদি-বুড়ীকে ঘর হইতে নামাইয়া উঠানে শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। পায়ের উপর একখানি নামাবলী, মাথার নিকট নব-রোপিত তুলসী গাছ। তাঁহার তখন শ্বাস উঠিয়াছে। কয়েকজন ব্রাহ্মণ যুবক শিয়রে বসিয়া নাম শুনাইতেছে। বালক-বালিকার দল ভাঙা পাঁচ-চালার বারান্দার উপর ম্লান মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; আমিও তাহাদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলাম।—দিদিবুড়ী আর আমাদের রূপ-কথা শুনাইবে না, আর দুধের চাঁছি খাইতে দিবে না। মনে হইল, আমার বুকের মধ্য হইতে কি যেন একটা শক্ত জিনিস ঠেলিয়া গলার দিকে উঠিতেছে। মাঝে মাঝে যেন হঠাৎ দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে, চোখ ঝাপসা হইয়া উঠিতেছে।

উঠানের এক প্রান্তে পোড়ো ভিটার কাছে দল বাঁধিয়া দিদিবুড়ীর খাতকেরা বসিয়া আছে,—নির্বাক শোকের প্রতিচ্ছবি। তাহারা অন্ত্যজ, ব্রাহ্মণ-বিধবার সুপবিত্র অন্তিম শয্যার নিকটে আসিবার অধিকার তাহাদের নাই। হতভাগ্যেরা ইংরাজি পড়ে নাই, জানে না যে আজ তাহারা কত বড় একটা শোষণের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতেছে। সুদ আর তাহাদিগকে দিতে হইবে না, আসল টাকাও চিরদিনের জন্য মাপ হইয়া গেল। তবু তাহারা কাঁদিতেছে। মূর্খ আর কাহাকে বলে! আমার জেঠতুত দাদা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। থাকিলে নিশ্চয় তাহাদিগকে এই শোষণ-মুক্তি দিবসের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন।

বেলা প্রায় এক প্রহর হইয়া গেল। সমানে নাম শুনানো চলিতেছে। ভিড় আরও কিছু বাড়িয়াছে। এমন সময় দেখা গেল

কেষ্ট সর্দার দুধের ঘটি হাতে করিয়া সেই দিকে আসিতেছে। সে কোন খবরই রাখিত না। আগের দিন জামাইয়ের অসুখের সংবাদ পাইয়া ওপারে মেয়ের বাড়ী গিয়াছিল। এই মাত্র ঘরে ফিরিয়া গাই দুইয়া দিদিবুড়ীর দুধটুকু দিতে আসিয়াছে। লোক-সমাগম দেখিয়া প্রথমে সে একটু হক্‌চকাইয়া গেল, তাহার পর যখন ব্যাপার বুঝিতে পারিল তখন একেবারে হাঁউ মাউ করিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—কত্তামার দুধ। কত্তামার নাম করে নিয়ে আসা দুধ! এ দুধ আমি কোন্‌খানে নিয়ে যাবো? আমারে বলে দ্যান, কত্তাবাবুরা, এ দুধ নিয়ে আমি কি করবো?

কেষ্ট সেইখানেই মাটির উপর ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল; বসিয়া বসিয়া বালকের মত হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল। অশ্রুর ছোঁয়াচ লাগিয়া আরও অনেক চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। খাতকের দল একসঙ্গে গুমরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শিরোমণি মহাশয় কেষ্টর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন ও নিম্নকণ্ঠে তাহাকে কি যেন বলিলেন। শুনিয়া কেষ্ট কান্না থামাইয়া কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে চাহিয়া রহিল। তাহার পর দুধের ঘটিটি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিরোমণি মহাশয়ের সঙ্গে দিদিবুড়ীর দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। ঈষৎ বিস্মিতভাবে সকলে সরিয়া গিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। যেখানে দিদিবুড়ীর পা দু'খানি ছিল তাহার হাত দুয়েক দূরে গিয়া কেষ্ট থামিল। দুধের ঘটি মাটিতে রাখিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গলবস্ত্রে গড় হইয়া প্রণাম করিল। তাহার পর পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘটি হইতে দুধটুকু আলগোছে দিদিবুড়ীর দুই পায়ের উপর ঢালিয়া দিতে লাগিল। শিরোমণি মহাশয়ের ইঙ্গিতে ব্রাহ্মণ-যুবকেরা আরও জোরে জোরে নাম শুনাইতে লাগিল। আমরা পাঁচ-চালার বারান্দার উপর হইতে দেখিলাম, দিদিবুড়ীর চোখের পাতা দুইটি একবার থর থর করিয়া একটু কাঁপিল, মুখের লোলচর্মের কুঞ্চন-রেখাগুলি একটি বিশেষ

ভঙ্গিতে ঈষৎ সঞ্চালিত হইল। আর কেহ না বুঝিলেও আমরা শিশুর দল বুঝিতে পারিলাম দিদিবুড়ী হাসিতেছেন।

ইহার মিনিটখানেক পরেই দিদিবুড়ী শেষ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। শেষবারের মত 'সুদির দুধ' শোধ করিয়া দিয়া কেষ্ট সর্দার চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

তাহার পর অনেক পড়াশুনা করিয়াছি। শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী-সংগ্রামের সিদ্ধান্ত উত্তমরূপে অধিগত করিয়াছি। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পর্ণকুটিরের আঙ্গিনায় দিদিবুড়ীর মৃত্যুকালে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ অনুযায়ী তাহার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজিও করিয়া উঠিতে পারি নাই।

৪

দিদিবুড়ীর মৃত্যুর প্রায় বছরখানেক পরে তাঁহার বহুকাল নিরুদ্দিষ্ট পুত্র ভীমচন্দ্র হঠাৎ গ্রামে ফিরিয়া আসিল। হাতে বেশ কিছু পয়সা লইয়া আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ আসিয়াই সে মায়ের জীর্ণ কুঁড়েঘরখানি মোটামুটি সংস্কার করাইয়া লইল এবং তাহার মধ্যে গৃহস্থালি পাতিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। মায়ের খাতকদের সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখিয়া শুধু গাঁঠের কড়ি খরচ করিয়াই সে সংসার চালাইতে লাগিল।

বলা বাহুল্য ভীম ঠাকুরের এই আকস্মিক প্রত্যাগমন গ্রামের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য ও কৌতূহলের সঞ্চার করিল। আমরা ছেলের দল একদিন সদলবলে গিয়া দূর হইতে লোকটিকে দেখিয়া আসিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে পেটের প্লীহা চমকাইয়া গেল। ঝাড়া ছয় ফুট লম্বা চেহারা ;—এককালে সত্যই হয়তো ভীমের মত বলিষ্ঠ ও বিশাল ছিল, কিন্তু এখন শরীরের সমস্ত মাংস ও পেশী গলিয়া ঝরিয়া গিয়া একখানি বিরাট কঙ্কালে পরিণত হইয়াছে। একমাথা রুক্ষ ঝাঁকড়া শ্বেতাভ ধূসরবর্ণ চুল, মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, কোটরগত অথচ অতি-বিস্ফারিত চক্ষু, পরিধানে রক্তাম্বর, কপালে প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় তিন ফের্তা করিয়া জড়ানো রুদ্রাক্ষের মালা। হিসাব মত বয়স হওয়া উচিত ষাট বাষট্টি ; কিন্তু সমস্ত শরীর পাকাইয়া শুকাইয়া এমন ঝিঁকুট হইয়া গিয়াছে যে দেখিয়া পঁয়তাল্লিশ কি পঁচাত্তর কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

ভীম ঠাকুর একা আসে নাই, হিমিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। হিমির বয়স সাতাশ কি আটাশ হইবে। চিক্কণ শ্যামবর্ণ দেহের প্রতি

অঙ্গে অটুট যৌবনের স্থির-বিদ্যুদ্দীপ্তি। সে বিধবার মত থান কাপড় পরে, কপালে বা সিঁথিতে সিঁদুর দেয় না, ঘন ঘন পান-দোক্তা খায়, ভীম ঠাকুরের পাতে মাছের মুড়ার প্রসাদও পায়। বস্তুতঃ তাহার সহিত ভীম ঠাকুরের সম্বন্ধের মধ্যে কোন প্রকার অস্পষ্টতা ছিল না; দুই পক্ষের কোন পক্ষ হইতে সম্বন্ধ-গোপনের কোন প্রয়াসও ছিল না। অবশ্য ভীম ঠাকুর নিজের জাতি নষ্ট হইতে দেয় নাই; স্বপাকে আহার করিত। হিমি বাজার করিত, মাছ তরকারি কুটিত, রন্ধনের উদ্যোগ আয়োজন করিয়া দিত। সে ছিল জাতিতে বাগ্‌দী-দুহিতা, তাহাকে হেঁশেলে ঢুকিতে দেওয়া কোন সদ্‌ব্রাহ্মণের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ইহার ফলে উভয়ের আত্মিক ও দৈহিক ঘনিষ্ঠতার পথে কোন প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয় নাই।

বামুনের ভিটায় এইরূপ অনাচারের ফলে গ্রামের মধ্যে প্রথম প্রথম একটু ক্রোধ ও অসন্তোষের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাহা লইয়া আলোচনা বা সমালোচনার বাড়াবাড়ি কিছু হয় নাই। কারণ কিছু দিনের মধ্যেই বুঝা গেল ভীম ঠাকুর সমাজ ও সামাজিকতার বাহিরেই বাস করিতে চায়। কাজেই সমাজও তাহাকে লইয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিল না।

হিমির পিত্রালয় ছিল বাঁকুড়া জেলার কোন এক সুদূর পল্লী-গ্রামে। তাহার মুখে 'খাবেক নি' 'লিবেক নি' প্রভৃতি অদ্ভুত ধরণের বাক্যবিন্যাস শুনিয়া গ্রামের সকলেই খুব কৌতুক অনুভব করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া দেখা গেল হিমি খুব মিশুক ও মজলিশি স্বভাবের লোক। সে যেখানে বসিত সেখানেই হাসিয়া গল্প করিয়া ছড়া কাটিয়া গান গাহিয়া আসর জমাইয়া তুলিত। কাজেই মেয়েমহলে শীঘ্রই সে খুব সমাদৃত হইয়া উঠিল। খাটিতেও পারিত সে অসাধারণ। কাহারও বাড়ীতে কোন কাজ-কর্ম হইলে সে গায়ে পড়িয়া গিয়া উপস্থিত হইত, দশটা ঝি-চাকরাণীর কাজ একা উদ্ধার করিয়া দিত,

তাহার পর উঠানে পাত পাড়িয়া হাসিমুখে এক পেট খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ঘরে ফিরিত। পাড়ার মেয়েরা সকলে শীঘ্রই তাহার দিদি খুড়ী মাসী পিসী হইয়া উঠিল। ভীম ঠাকুর দেশের ছেলে হইয়াও পর হইয়া রহিল, বিদেশিনী হিমি গ্রামের আপনার জন হইয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে কানাঘুষা শোনা যাইতে লাগিল, ভীম ঠাকুর নাকি মস্ত বড় 'সাধক' হইয়া আসিয়াছে। সে পিশাচ-সিদ্ধ, মন্ত্র পড়িয়া ভূত-প্রেত নামাইতে পারে। একজোড়া 'যোগিনী' নাকি তাহার হাতধরা হইয়া আছে। মারণ উচাটন বশীকরণ প্রভৃতি নানারূপ সিদ্ধাই সে গুরুকৃপায় অধিগত করিয়াছে; ঝাড়ফুঁক মন্ত্র-তন্ত্রে তাহার জুড়ি মেলা ভার। প্রতি শনি-মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে সে নাকি তান্ত্রিক মতে ঘটস্থাপনা করিয়া কালীপূজা করিয়া থাকে, আর সেই সময় তাহার পূজার আসনের চারিদিকে নাকি নানা অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। জনশ্রুতির ফলে ধীরে ধীরে ভীম ঠাকুরের আড্ডা জমিয়া উঠিতে লাগিল। বেচা মিত্তির, হারু দত্ত, গেনু চক্রবর্তী, বিলাস বৈরাগী, দেবনাথ সর্দার, মৃত্যুঞ্জয় পাল প্রভৃতি গ্রামের বাছা বাছা ভক্তের দল সাধন-পন্থার সন্ধানে আসিয়া ভীম ঠাকুরের শরণাপন্ন হইল। আমাদেরও অপরিচয়-জনিত ভীতি ততদিনে কাটিয়া গিয়াছিল, অপরিসীম কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া এই অপরূপ আড্ডাটির আশে পাশে আনাগোনা শুরু করিয়া দিলাম।

আড্ডাটি বসিত, প্রত্যহ বেলা আড়াইটা তিনটার সময়, আর শেষ হইত শুনিয়াছি অনেক রাত্রে। ভীম ঠাকুর একখানি ঘুনে-খাওয়া রেঁায়া-ওঠা ব্যাঘ্রচর্ম পাতিয়া ঘরের এক কোণে উপবেশন করিত। সম্মুখে একটি ছেঁড়া মাদুর পাতা থাকিত,—ভক্তেরা কেহ কেহ তাহার উপর, কেহ কেহ বা কয়েকটি তালপাতার চাটাইয়ের উপর আসন গ্রহণ করিত। আধ্যাত্মিক চর্চা কি হইত তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না, তবে গঞ্জিকা-চর্চা প্রচুর পরিমাণেই

হইত। গেদু চক্রবর্তীকে আমরা নিজের মুখে বলিতে শুনিয়াছি যে আট ছিলিমের কমে কোনদিন আসর মিটিত না, মাঝে মাঝে দশ বার ছিলিম পর্যন্ত চলিত। ভক্তেরা সকলেই এই তুরীয় আনন্দের অংশ গ্রহণের অধিকারী ছিল। দুই এক দিন একটা কালো বোতল বাহির হইত। মন্ত্রপূত ধান্যেশ্বরী কারণে পরিণত হইতেন এবং এই কারণ পান করিবার জন্য ভীম ঠাকুর একটা মড়ার মাথার খুলি ব্যবহার করিত। দেখিয়া ভক্তদের ভক্তি দশগুণ বাড়িয়া যাইত।

নবাগত গুরুজির খ্যাতি ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ভীম ঠাকুর তাবিজ কবজ দিতে আরম্ভ করিল, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত নব-নারীকে শ্মশান-কালিকার হোমভস্ম বিতরণ করিতে লাগিল এবং আরও নানা প্রকাব গোপন ক্রিয়া কলাপেব বেসাতি খুলিয়া বসিল। মক্কেল ভালোই জুটিতে লাগিল,—কারণ গঞ্জিকা-প্রসাদ-লোভী ভক্তদের ঢাক পিটানোব আব বিরাম ছিল না। সিধা ও দক্ষিণার আমদানী শুরু হইল। হিমির কাজ বাড়িয়া গেল।

অতিরিক্ত মাত্রায় গাঁজা খাইয়া খাইয়া ভীম ঠাকুরের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক রকম তীক্ষ্ণ ও কর্কশ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বাজখাঁই আওয়াজে 'এ্যাক্‌টো' করিবার ভঙ্গিতে সে যখন তাহার ভ্রাম্যমাণ সাধক জীবনেব বিচিত্র ও অলৌকিক কাহিনীসমূহ বর্ণনা করিয়া শুনাইত তখন শ্রোতার দল ভয়ে ভক্তিতে বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হইয়া যাইত। এইসব রোমাঞ্চকর কাহিনীর লোভেই আমরা পাড়ার ছেলেব দল সেই রহস্যময় কুটিরের বারান্দায় বা আনাচে কানাচে ঘুর ঘুর করিরা বেড়াইতাম। লোকটা অনেক দেশ ঘুরিয়াছিল, দিদিবুড়ীর গল্প বলার আর্টও খানিকটা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিল। দুই তিন ছিলিম গাঁজা পুড়িয়া নিঃশেষ হইবার পর সকলেরই যখন নেশা বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিত তখন প্রায় প্রতিদিনই সে ভক্তবৃন্দের

চিত্ত-বিনোদন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের উদ্দেশ্যে নিজের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার থলি খুলিয়া গল্প বলিতে বসিত। কাজেই আমাদের সুযোগের অভাব হইত না। সব কথা তখন বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু বোঝা না-বোঝার সংমিশ্রণে মনের মধ্যে যে অদ্ভুত অনুভূতির সঞ্চার হইত তাহার ফলে সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। খানিকটা আকৃষ্ট হইতাম, খানিকটা ভয় পাইতাম। ভীম ঠাকুরের আড্ডার কাছে না গিয়াও থাকিতে পারিতাম না, আবার একা যাইবার সাহসও কখনো হইত না।

এক দিনের কথা বলিতেছি।

বেচা মিত্তির বুঁদ হইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ চোখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, গুরুজি, আপনি কাশী গেছেন? সেখানকার মণিকর্ন্নিকা শ্মশানে নাকি রোজ দশ হাজার চিতে জ্বলে? আর সেখানে নাকি দলে দলে অঘোরপন্থী সন্নিসি ঘুরে বেড়ায়,—চিতের ওপর থেকে আধপোড়া মড়া ছিনিয়ে নিয়ে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়?

একটা অতি উচ্চ দরের হাসি হাসিয়া ভীম ঠাকুর জবাব দিল,—কাশী? আরে কাশী তো ঘরের গোড়ায়। আমি যাই নি কোথায়? ভূ-ভারতের সব তীর্থ শেষ করেছি, আর আমাকে আজ তুই কাশীর গল্প শোনাচ্ছিস! শোন্ তবে। কাশী গয়া মথুরা বিন্দাবন সব পার হয়ে গেলাম নৈনিতাল,—নৈনিতাল, বুঝলি, যার পশ্চিমে আর দেশ নেই। নৈনিতালে কি আছে জানিস্? সেখানে আছে পেল্লায় বড় একটা 'রদ'। 'রদ' কি জিনিস বল্ তো দেবা?

দেবনাথ থতমত খাইয়া বলিল,—শিবমন্দির বোধ হয়।

—তোর মাথা। 'রদ' হলো গিয়ে একটা পুকুর। শিরোমণি মশাই-এর পুকুর তো দেখছিস,—ওর হাজারটা একসঙ্গে করলে

যত বড় হয় তত বড়। আর সে 'হ্রদের' কি গুণ! তিনটে ডুব দিয়ে সূয্যি-পেন্নাম করে যে যা চায় তাই পায়। পাণ্ডা ঠাকুর বল্লে,—চেয়ে নাও, বাবুজি, ধন-দৌলৎ গাড়ী-ঘোড়া দাস দাসী রাজার রাজত্বি যা চাইবে তাই পাবে। ডুব দিলাম, কিন্তু চাইবার সময় মুখ দিয়ে শুধু বেরুল,—সদ্‌গুরু দাও।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ভীম ঠাকুর ভক্তবৃন্দকে তাহার নিঃস্বার্থ ধর্মপ্রাণতার পরিমাণটা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবার সুযোগ দিল। তাহার পর পুনরায় বলিতে শুরু করিল,—পেয়েছিলামও, ভগবান দিয়েছিলেন জুটিয়ে। 'হ্রদের' পশ্চিম পারে বিরাট জঙ্গল, তার মধ্যে বাস করেন মোহান্ত উধোম বাবা,—ডাকসাইটে সাধক। বসলে পরে মুখের দাড়ি মাটিতে লুটোয়, এক একটা জটা যেন এক একটা সুঁদরির গরান। উদোম ন্যাংটো, গাছের তলায় ধুনি জ্বেলে তারই পাশে দিনরাত বসে থাকেন। আর তিনশো পঁয়ষট্টিটা তাঁবুর মধ্যে আছে তিনশো পঁয়ষট্টিজন সেবাদাসী। বুঝলি তো? বছরের এক এক দিনের জন্য এক একজন।

ভক্তমণ্ডলীর মুখ হইতে একযোগে একটা দীর্ঘচ্ছন্দের উ-স্-স্ ধ্বনি নির্গত হইল।

—আমাকে দেখে মোহান্তজি তো ভারী খুসি। বল্লেন,—রয়ে যা বেটা আমার সঙ্গে, তোকে পুষ্যিপুত্তুর নেব। নিজের ছেলেমেয়ে একটাও নেই কি না! কিন্তু সইলো না, বুঝলি বেচা, অদৃষ্টে সইলো না। তীথের টান যে কি টান তা তোরা বুঝতে পারবি নে।—আবার বেরিয়ে পড়লাম। পাহাড়-পব্বোত ডিঙিয়ে হরিদ্বার কনখল পার হয়ে চলে গেলাম কেদার-বদ্‌রি। সেখান থেকে আবার হিমালয়ের ভেতর দিয়ে ছ'মাস হেঁটে গিয়ে পৌঁছুলাম সে-ই উত্তরে অমরনাথে। সেখানে চারিদিকে খালি বরোফ! কন্‌কনে হিমে হাড় কালিয়ে ওঠে, দিনে অন্ততঃ বত্রিশ ছিলিম টেনে না নিলে হাত পা নাড়বার ক্ষেমতা থাকে না। মুখের ভেতর থুতু জমে বরোফ

হয়ে যায়, ধুনির কাঠ মুখের মধ্যে পুরে আবার গালিয়ে নিতে হয়। শৌচকর্মের জন্য পর্যন্ত একটু জল পাবার যো নেই, অশুচি অবস্থাতেই পূজো-আচ্চা সারতে হয়।—এই গেল উত্তর আর পশ্চিমের কথা। দক্ষিণে গেছি সেই রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত। রামচন্দ্রের তৈরি পাথরের সাঁকো সেখানে এখনো বত্তোমান। তার ওপর দিয়ে হেঁটে সমুদ্দুর পার হয়ে সোজা সন্নলঙ্কা পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়।

ইত্যবসরে নূতন এক ছিলিম সাজা হইয়াছিল। গুরুজি তাহাতে প্রচণ্ড একটা দম দিয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। তাহার পর কলিকাটি ভক্তদের হাত হইতে হাতে ঘুরিতে লাগিল, কুটিরের অভ্যন্তর ধোঁয়ায় ঝাপসা হইয়া উঠিল।

ভীম ঠাকুর গলাটা একবার ঝাড়িয়া লইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—সোঁদর বনের কাঁচা বাদায় কেওড়া গাছের তেফরকায় বসে একাসনে একাদিক্রমে সাত বচ্ছর সাধনা করেছি। সকালে দুপুরে বিকেলে পেত্যহ তিনটি করে পাকা কেওড়া ফল আপনা আপনি টুপ্ করে খসে কোলের ওপর পড়তো। তাই খেয়েই দিন কাটতো। কাঁচা বাদা,—রোজ দুবার জোয়ারের জলে ডাঙা ভেসে যেত। নীচে চেয়ে দেখতাম, কুমীরের দল হড়হড়িয়ে বেড়াচ্ছে, বড় বড় জোলো সাপ সাঁ সাঁ করে সাঁতার দিয়ে যাচ্ছে। আবার ভাঁটার সময় শুক্‌নো ডাঙায় হরিণের পাল ঘুরে বেড়াতো, আর তাদের পিছু নিয়ে আসতো কেঁদো কেঁদো বাঘ। কি তাদের ভয়ানক চেহারা, আর কি তাদের হ্যাঁক-ডাক! তোরা কেউ হলে—হুঁ!

ভক্তের দল একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল। ভীম ঠাকুর চোখ বুজিয়া কি যেন একটু ভাবিয়া লইল; তাহার পর বলিতে লাগিল,—এইখানে পাঁচ বছরের মাথায় একটা বড় মজার ব্যাপার হয়েছিল। এক ব্যাটা বাঘ একদিন কেওড়াতলা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ওপর দিকে চেয়ে আমাকে দেখতে পেল। ব্যাটার বোধ হয় বয়স কম ছিল, লোক চিনবার ক্ষেমতা তখনও হয় নি। আমাকে দেখেই

খুব হালুম-হুলুম করতে আরম্ভ করে দিল, ঘন ঘন ওপরদিকে লাফও দিতে লাগলো। মতলবটা এই যে আমাকে পেলে খায়। প্রথমটা আমি কিছুই বুঝতে পারি নি, নিজের মনে সাধন ভজন নিয়ে ছিলাম। খুব বাড়াবাড়ি করতে লাগলো যখন তখন ধ্যান ভঙ্গ হলো। নীচে চেয়ে দেখি—এই ব্যাপার। মনে মনে বড় হাসি পেল ব্যাটার রকম দেখে। তার চোখে চোখ রেখে ছোট্ট একটা ধমক দিয়ে বললাম,—কি রে ব্যাটা, এত হৈ-চৈ লাগিয়েছিস কেন? আমি সাধু মানুষ, দেখতে পাচ্ছিস নে? আমাকে খাবি? দেব নাকি মুখ-বন্ধন মন্তর ঝেড়ে,—চির জীবনের মত সব খাওয়া ঘুচে যাবে!—ব্যাস্! ব্যাটা যেন কেঁচো হয়ে গেল। বেড়ালের মত ঘড় ঘড় করতে করতে গাছের গায়ে গা ঘসতে লাগলো। তারপর চুপচাপ চলে গেল। এরপর মাঝে মাঝে বাঘটা সেখানে আসতো, আর যখনই আসতো তখনই মুখে করে একটা শিকার নিয়ে আসতো,—কোনদিন হয়তো একটা হরিণ, কোন দিন বা একটা শুওর। আমাকে ভেট দিতে আসতো আর কি! আমি যে নিরাহারী সাধক তা কি ব্যাটার বুঝবার সাধ্যি ছিল?—তারপর সাত বছর পরে আমি গাছ থেকে মাটিতে নেমে এলাম, সাধনা সম্পুন্ন হলো। কিন্তু মাটিতে নেমে দেখি আমার আর খাড়া হয়ে দাঁড়াবার ক্ষেমতা নেই। অনাহারে অনাহারে শরীর একেবারে অস্থিচম্মোসার দুব্বল হয়ে পড়েছে। এখন এতটা পথ হেঁটে জঙ্গল পার হয়ে লোকালয়ে যাই কি করে? ভেবে কোন কুল-কিনারা পাচ্ছি নে এমন সময় সেই বাঘটা এসে উপস্থিত হলো। এসেই আমাকে মাটিতে দেখে একেবারে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ তার চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। সেও আমার মনের কথা বুঝলো, আমিও তার মনের কথা বুঝলাম। তারপর আর কি! ঘোড়ায় চড়ার মত করে তার পিঠে চেপে বসলাম, আর সে রাতারাতি জঙ্গল

পার করে আমাকে গেরামে পৌঁছে দিয়ে গেল। —তারা! তারা! ব্রহ্মময়ী মা! আরেক ছিলেম চড়া বিলেস!

আর এক দিনের কথা।

গেমু চক্রবর্তী হাত জোড় করিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, একটা কথা জিগ্যেস করতে চাই দেবতা,—ভয়ে বলবো না নিভ্‌ভয়ে বলবো?

ভীম ঠাকুর ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল,—গুরু শিষ্যের কথা এর মধ্যে আবার ভয়টা কিসেব? যা বলতে চাস্ নিভ্‌ভয়েই বল্।

—আজ্ঞে, দেব্‌তা, কামিনী এখন কোথায়?

পরম ঔদাসীন্যের সহিত ভীম ঠাকুর প্রশ্ন করিল,—কামিনী কে?

—আজ্ঞে, কামিনী, আমাদের হরিশ রক্ষিতের বোন কামিনী। আপনি যখন ঘর ছাড়েন তখন যে আপনার সঙ্গে—

—ও বুঝেছি। কামিনী—কামিনী—তা সে এখানেই আছে—এই গেরামেই আছে।

—আজ্ঞে সে কি! গেরামেই আছে! কৈ আমরা তো কোনদিন—

—না, তোরা তাকে দেখতে পাবি নে! দেখলেও চিনতে পারবি নে। আমার সামনেও সে আসে না,—পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। তবে এই গেরামেই সে আছে!

—কথাটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না দেব্‌তা!

—বুঝতে পারলি নে? আচ্ছা, তবে বুঝিয়ে বলছি, শোন্। বাবার মিত্যুর পর মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। চিরকালই ধম্মোকম্মোর দিকে একটা টান ছিল কি না। ভাবলাম—এই তো জীবন! এই তো সংসার! এর জন্য আর টান কেন? এইবার বেরিয়ে পড়া যাক্। কিন্তু ধম্মো তো একা হয় না, সাধন-পথে চলতে হলে সঙ্গে শক্তি চাই। কামিনী ছুঁড়িটার মধ্যে নায়িকা-লক্ষণ

ছিল, মনে হলো তন্ত্র-সাধনায় শক্তি হবার যোগ্যতা ওর আছে। দাদার সংসারে দাসী-বাঁদীর মত পড়ে ছিল, নিত্যি নানা অত্যেচার সইতে হতো। প্রস্তাবটা করতেই এক কথায় রাজি হয়ে গেল। দু'জনে ভেসে পড়লাম। —কিন্তু আমার ভুল হয়েছিল, গেনু, ঠিক লোক চিনতে পারি নি। দু'চারটে ভাসা ভাসা লক্ষণ দেখেই ভুলে গিয়েছিলাম। তখনও তো নারীচরিত্তির বুঝবার মত অন্তরদিষ্টি লাভ করি নি! ছুঁড়ির মনের মধ্যে যে অধম্মো রয়েছে তা বুঝবো কি করে?

ভীম ঠাকুর গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া পুনরায় তাহার কাহিনী শুরু করিল,—বছর দুয়েক এদেশ ওদেশ ঘুরে শেষটায় কামরূপ কামিখ্যেয় গিয়ে উপস্থিত হলাম। তন্ত্র-সাধকেব পক্ষে তো ওখানে না গিয়ে উপায় নেই;—সব্বোপেরকার সিদ্ধাই-এর জম্মোস্থান, সাক্ষাৎ মা চণ্ডিকের নীলেভূমি কিনা! ওখানকার যোনিপীঠে সাড়ে ন' মাস আসন না করলে কেউ সিদ্ধিলাভ করতে পাবে না। গুরুও জুটে গেল ভাল। হাড়িপা বড়গোঁহাই-এর নাম শুনেছিস তো? —শুনিস্ নি? কিই বা তোরা শুনেছিস! সারাটা জীবন তো কূয়োর ব্যাঙের মতই কাটিয়ে গেলি। অতবড় তন্ত্র সাধক ভূ-ভারতে আব নেই। কট্‌মট করে চাইলে মাটিতে আগুন জ্বলে। মা! মা!—বলে হাঁক দিলে কামিখ্যে মায়ের অঙ্গ দুলে ওঠে। তাল বেতাল সিদ্ধ মহাপুরুষ, আঠারো যোগিনী তাঁর সেবাদাসী, পঞ্চ-মকারে সমান অধিকার। বড়গোঁহাই আমাকে বললেন,—বাবা তোমার শরীরে আমি শ্রেষ্ঠ সাধকেব লক্ষন দেখছি। দেড়টি বছর আমার কাছে থাকো। অষ্ট-সিদ্ধাই তো তোমার হাতের পাঁচ, তোমাকে আমি নির্বিকল্পো সমাধি পর্যন্ত পাইয়ে দিচ্ছি।—আমিও হাতে সগ্‌গো পেলাম, আদাজল খেয়ে সাধনায় লেগে গেলাম। এমনি করে দিন যায়। আমি সাধন-ভজন নিয়েই থাকি। আহার-নিদ্রের পর্যন্ত সাবকাশ

পাইনে। এদিকে কামিনী ছুঁড়িও যে অন্য রকম সাধনায় মেতে উঠেছে তার কিছুই খবর রাখি নে। একদিন দুপুর রাতে আসনে বসে রয়েছি এমন সময় ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল। মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো, আর আসনে না বসে সোজা ঘরে ফিরে এলাম। এসে দেখি ছুঁড়ি আমারই বিছানায় বড়গোঁহাই-এর নতুন চেলা সুরেন্দর হ্যাওড়ার সঙ্গে জড়াজড়ি করে শুয়ে রয়েছে।—তারা! ব্রহ্মময়ী মাগো!

ঠিক নাটকীয় মুহূর্ত্তটিতে আসিয়া ভীম ঠাকুর সহসা থামিয়া গেল। ভক্তের দল ঔৎসুক্যে উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল। অবশেষে বিলাস আর থাকিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তার পর কি হলো দেব্‌তা?

—তারপর? সুরেন্দর ছোঁড়া তো ধড়মড় করে উঠে ছুটে পালিয়ে গেল, আর কামিনী আমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো। রাগে আমার সব্বোশরীর জ্বলছিল। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! একবার ইচ্ছে হলো ছুঁড়িকে অগ্নিমন্তরে ভস্‌সো করে ফেলি, কিন্তু সামলে গেলাম। কোরোধ চণ্ডাল,—সাধকের পক্ষে কোরোধের বশোবত্তি হয়ে কোন কাজ করা উচিত হবে না। একটু ভেবে মাথার চুলের ভেতর থেকে একটা অভিচার-মন্তর পড়া জবা ফুল বের করে সেটা তার গায়ে ছুড়ে মারলাম। অমনি চক্ষের নিমিষে ছুঁড়ি একটা হলদে পাখি হয়ে ঘরের মধ্যে ঝট্‌পট্‌ করে উড়ে বেড়াতে লাগলো। তখন ঘরের একটা জানালা খুলে দিয়ে বললাম,—যা, ধানসোনার হলদে পাখি, ধানসোনায় ফিরে যা! —পাখি ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। তাই বলছিলাম, কামিনী এই গেরামেই আছে।

বেচা মিত্তির বলিল,—কিন্তু একটা পাখি বই তো নয়। সে কি আর এতদিন বেঁচে আছে?

প্রশান্ত আশ্বাসের সুরে ভীম ঠাকুর বলিল,—আছে রে, আছে। মন্তরের গুণে শুধু দেহটাই বদ্‌লে গেছে, মনিষ্যির পরমাই তার

ঠিক বজায় আছে। আমার সব গুণে গেঁথে দেখা আছে, কামিনীর মরতে এখনও অনেক দেরী। তোরা হয়তো তাকে দেখেছিস, কিন্তু চিনতে পারিস নি। আমি দেখলেই চিনতে পারতাম। কিন্তু লজ্জায় ভয়ে সে আমার সামনে আসছে না, কেবলই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

ভয়ে কাঁটাটি হইয়া ঘরে ফিরিলাম। তাহার পর হইতে হলদে পাখি দেখিলেই মনটা দুঃখে ও করুণায় ভরিয়া উঠিত। আহা রে! এই বোধ হয় সেই কামিনী,—নিজের গ্রামে পাখি হইয়া উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে; ঘর থাকিলেও ঘরে ফিরিবার উপায় নাই; পোকা-মাকড় ফল-পাকড় খাইয়া পেট ভরাইতে হয়, গাছের ডালে রাত্রি কাটাইতে হয়। ভীম ঠাকুরের বিরুদ্ধে একটা আতঙ্ক-মিশ্রিত আক্রোশ মনের মধ্যে গজরাইতে থাকিত।

আড্ডা ভাঙিয়া গেলে অনেক রাত্রে হিমি যোগাড় করিয়া দিত, ভীম ঠাকুর দুই জনের মত খিচুড়ি ফুটাইয়া লইত। দুষ্ট লোকে বলিত, রাত্রির রন্ধন নাকি হিমিই করিয়া থাকে।—অত রাত্রে কে আব দেখিতে আসিতেছে?

ভীম ঠাকুরের পশার ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। দূর দূর গ্রাম হইতে নূতন নূতন মক্কেল আসিতে আরম্ভ করিল। শুনিলাম বড় পাঁচ-চালা ঘরখানা নাকি মেবামত করা হইবে, তারপর ভীম ঠাকুর তাহাতে মহাকালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা কবিবে। অবশেষে দেখা গেল সৌ-পাড়ার ডাকসাইটে কৃপণ বুড়া দীনু মহাজন পর্যন্ত আড্ডায় আনাগোনা আরম্ভ শুরু করিয়াছে। সকলেই বুঝিল ভীম ঠাকুর এইবাব চুনোপুঁটি ছাড়িয়া রুই কাতলা গাঁথিবার মৎলবে আছে।

দেখিতে দেখিতে প্রায় মাস ছয়েক কাটিয়া গেল। হিমি গালে পান-দোক্তা ঠুসিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়। ভীম ঠাকুর ভক্তমণ্ডলীকে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে গঞ্জিকা-প্রসাদ ও অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ বিতরণ করে। সমস্তই গ্রামের লোকের বেশ

গা-সওয়া হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একদিন প্রাতঃকালে তুইটি আর্তকণ্ঠের সমবেত চীৎকারে পাড়া উচ্চকিত হইয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম হিমি বারান্দায় বসিয়া গালে হাত দিয়া মড়াকান্না জুড়িয়া দিয়াছে, আর উঠানে দাঁড়াইয়া দীনু মহাজন অনর্গল অশ্রাব্য ভাষায় গালিবর্ষণ করিয়া যাইতেছে। ব্যাপার কি বুঝিতে বেশী বিলম্ব হইল না। ভীম ঠাকুর আবার ভাগিয়াছে। এবার সে একাই গিয়াছে। যে হিমিকে ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে সে শতবার 'আদর্শ নায়িকা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, যাইবার সময় তাহাকেও সঙ্গে লইয়া যায় নাই। তাই হিমি কাঁদিতেছে।

দীনু মহাজন ঘটিত রহস্যের সমাধানও তুই একদিনের মধ্যেই হইয়া গেল। ভীম ঠাকুরের নানা অলৌকিক ক্ষমতার কথা লোকমুখে বহু-প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যে ক্ষমতার কথা চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ-খণ্ডের ন্যায় দীনু বুড়াকে আড্ডায় টানিয়া আনিয়াছিল তাহা এই : ভীম ঠাকুর নাকি মন্ত্রবলে সোনারূপা দ্বিগুণ করিতে পারিত। কয়েকদিন আড্ডায় যাতায়াত করিয়া এবং গুরুজির বোলচাল শুনিয়া দীনুর দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে লোকটা সত্যই অসাধারণ মন্ত্রশক্তির অধিকারী। তাহার সাহায্য পাইলে দীনুর কৃপণের ভাণ্ডার তু'দিনেই ফাঁপিয়া দ্বিগুণ হইয়া উঠিবে। তাহার পর তাহাকে চতুর্গুণ করিয়া লইতেই বা কতদিন ?

লোভে বুড়া প্রায় পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারায় নাই। একসঙ্গে নিজের যথাসর্বস্ব ভীম ঠাকুরের হাতে তুলিয়া না দিয়া সে প্রথম দফায় দিয়াছিল মাত্র ষোল ভরি সোনা ও তুইশত কাঁচা টাকা। কথা ছিল কাল সারারাত্র জাগিয়া ভীম ঠাকুর একাকী প্রয়োজনীয় ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ড সমাপন করিবে, আজ সকালে আসিয়া দীনু স্বহস্তে তাম্রকুণ্ডের আচ্ছাদন উন্মোচন করিয়া মন্ত্রশক্তির ফল প্রত্যক্ষ করিবে।

তাম্রকুণ্ড অনাবৃতই পড়িয়াছিল। তাহার মধ্যে ছিল কতকগুলি বেলপাতা ও জবা ফুল, তিনটি পয়সা এবং একটি মরা তেলাপোকা। পয়সা তিনটি তুলিয়া লইয়া সযত্নে ট্যাঁকে গুঁজিয়া ফেরার গুরুজির উদ্দেশ্যে গালিবর্ষণ করিতে করিতে দীনু চলিল আড়াই ক্রোশ দূরে থানায়—ডাইরি করিতে।

হিমি গ্রামেই রহিয়া গেল। প্রথম সে খুব খানিকটা কান্নাকাটি করিল। তাহার পর চোখ মুছিয়া পাড়ায় বাহির হইয়া পড়িল, যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই ভীম ঠাকুরের বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া শুনাইতে লাগিল। হিমির গতর ছিল, খাটিয়া খাইতেও অনিচ্ছা ছিল না। সুতরাং জীবিকার জন্য তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। লোকের বাড়ী ধান ভানিয়া ক্ষার কাচিয়া গোবর ভাঙিয়া সে সহজেই নিজের ভাত-কাপড়ের সংস্থান করিয়া লইতে সক্ষম হইল।

কিন্তু ইহাও তাহাকে বেশীদিন করিতে হইল না। শীঘ্রই সে ঘোষবাবুদের সেজকর্তার নজরে পড়িয়া গেল। আর তাহার কোন অভাব রহিল না।

৫

শীতকালের সকাল। একখানি আধময়লা আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া এবং তাহারই এক প্রান্তে কতকগুলি মুড়ি বাঁধিয়া লইয়া আনন্দ মণ্ডলের উঠানে আসিয়া বসিয়াছিলাম। আনন্দ মণ্ডল রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া বসিয়া চটা চাঁছিতেছিল ও দেহ-তত্বের গান গাহিতেছিল। আমি গান শুনিতে শুনিতে মুড়ি খাইতেছিলাম।

আনন্দ মণ্ডলের বয়স ষাটের কম হইবে না, কিন্তু তাহার দৃঢ়-সংবদ্ধ পেশীপুষ্ট শরীর দেখিলে যৌবন অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। মাথার চুলগুলি সব শাদা, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন কোন যুবকের মাথায় খড়ির গুঁড়া মাখাইয়া যাত্রার দলের বুড়া সাজাইয়া দিয়াছে। গোঁফদাড়ি কামানো শ্যামবর্ণ মুখখানি, গলায় তুলসীর মালার কণ্ঠি। নমশূদ্র পাড়ায় আনন্দ মণ্ডলের সুগায়ক বলিয়া খ্যাতি ছিল। শৈশবে তাহার ভারী সুরেলা গলায় বহু সত্যকার লোকসঙ্গীত শুনিয়াছি, তাহার ঝঙ্কার এখনো স্মৃতির তারে বাজিতেছে। তাই যখন আজকাল সহুরে লোক-সঙ্গীতের অসহ্য ন্যাকামি রেডিও গ্রামোফোনের মারফতে শুনিতে বাধ্য হই, তখন সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠে। আসল জিনিস হারাইয়াছি তাহাতে তত দুঃখ নাই, কিন্তু অশ্বত্থামার দুগ্ধ পানের মত নকলকে আসল ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিবার মত চরম নির্বুদ্ধিতায় আমাদিগকে কেন পাইয়া বসিল ?

আনন্দ মণ্ডল গাহিতেছিল,—

সহজ গুরুর সাধন জানো মন।
সহজ মনের সহজ পীরিত,
সেই সাধনার ধন।

ছয়ের ঘরে একা প্রভু,
দীপ নেভে না সেথায় কভু,
ওরে, প্রেম ঘানিতে মন ভাঙিয়ে
দীপের তৈল কর আহরণ!
সেই সাধনার ধন।

গান শেষ করিয়া আনন্দ মণ্ডল বলিল,—গান তো শুনলে ছোট্‌ঠাকুর,—বলি গানের মধ্যে কিছু বুঝতি পারলে?

মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে নিশ্চিন্ত মনে মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিলাম কিছুই বুঝি নাই।

একটা চটার কাজ শেষ করিয়া আনন্দ মণ্ডল আর একটা চটা টানিয়া লইল, তাহার পর বলিল,—ত্যাখো ছোট্‌ঠাকুর, পূজো আছে, আচ্চা আছে, ধ্যান-ধারণা আছে, জপ-তপ আছে, হোম-জগ্যি আছে; ঠাকুরকে পাবার পথ তো আর একটা না। কিন্তু এ সব পথে চল্‌তি হলে বিদ্যে-বুদ্ধি জ্ঞান-গম্যি থাকা চাই। যার তা কিছু নেই, যে মুখ্‌খু, যে অজ্ঞান—তার তা হলি কি হবে? সাঁইগুরু তাই বলছেন যে তার পথ হলো সহজ পথ। এ পথে বিদ্যে লাগে না, বুদ্ধি লাগে না, জপ-ধ্যান মন্তর-তন্তর কিছু লাগে না। লাগে খালি ভালোবাসা আর বিশ্বেস। এখন দেখতি হবে, এই ভালোবাসা কারে বলে আর কিসি হয়?

কিন্তু ভালোবাসারূপ ঈশ্বর প্রাপ্তির সহজ পন্থার সংজ্ঞা ও উৎস নির্ণয় সে দিন আর সম্ভব হইল না। অদূরে একটা বড় রকমের সোরগোল শুনিতে পাইয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আনন্দ মণ্ডলও হাতের কাটারি মাটিতে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—চলো ছোট্‌ঠাকুর, দেখেই আসি ব্যাপারডা কি!

কিছুদূর আসিয়াই দেখিতে পাইলাম শিরোমণি মহাশয়ের পুকুরের এ পাশে সদর রাস্তার উপর গেনু চক্রবর্তী নাচিতেছে।

রাস্তায় রাস্তায় নাচিয়া বেড়ানো গেনুর পেশা নহে, আনন্দের

আকস্মিক আতিশয্যও তাহার নৃত্যের হেতু নহে। সে নাচিতেছিল, কারণ অপরিসীম ক্রোধে সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল; হাত পা ছুড়িয়া তিড়িং মিড়িং করিয়া লাফাইতেছিল আর তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। চটিয়া লাল হইবার তাহার উপায় ছিল না, কারণ তাহার গায়ের প্রগাঢ় তামাটে রঙ আগুনে তাতাইলেও লাল হইবার কথা নহে। লাল হইয়াছিল তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকৃতি চক্ষু দুইটি। ঘন ঘন গঞ্জিকা সেবনের ফলে চোখ তাহার প্রায় সব সময়েই ঈষৎ রক্তাভ হইয়া থাকিত,—ক্রোধের উত্তেজনায় এখন একেবারে জবাকুসুমসঙ্কাশং হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার খর্ব ও স্থূল তনুর একমাত্র অলঙ্কার প্রকাণ্ড লম্বোদরটি থল্ থল্ করিয়া দুলিতেছিল; মুখের ধূম্র-পিঙ্গল ঝাঁকড়া গোঁফ জোড়াটি বাত্যা-বিক্ষুব্ধ উলুখড়ের জঙ্গলের মত আলোড়িত হইতেছিল। সত্যই হাস্যকর দৃশ্য। উপস্থিত সকলেই হাসিতেছিল, আমিও হাসিয়া ফেলিলাম; আনন্দ মণ্ডল হাসিল না।

গেনু সমানে চেঁচাইতেছিল,—ওঃ! ভা-রী আমার সমাজপতি রে! বনগাঁয়ের শিয়াল রাজা! আমি একা মানুষ, মাগ নেই ছেলে নেই, চাল নেই চুলো নেই, দুবেলা দুমুঠো ভাত আর দু-ছিলিম গাঁজা হলেই দিন চলে যায়,—আমাব ওপর সমাজপতিত্তো ফলানো হচ্ছে! আমাকে একঘরে করবে!—ধোবা নাপিত বন্ধ করবে!—আমার সঙ্গে কেউ খাবে না!—কর! তো-শালাদের মনে যা আসে সব কর! আমার তাতে কলা হবে,—এই কলা হবে।

দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটি শূন্যে আস্ফালন করিয়া গেনু এক পাক উদ্দাম নৃত্য নাচিয়া লইল। তাহার পর অনর্গল কতকগুলা অশ্লীল গালি কুৎসিত ভঙ্গি সহকারে অনুপস্থিত সমাজপতি শিরোমণি মহাশয়ের উদ্দেশ্যে বর্ষণ করিয়া গেল। তাহার পর নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া আবার চেঁচাইতে শুরু করিল—জাত! জাত দেখাতে এসেছে গেনু চক্কোত্তিকে! বলি জা ‍ ‍ ‍চ্ছে কার এই

গাঁয়ে ? সব্বাই-এর হাঁড়ির খবর রাখিয়ে—সব্বাই এর হাঁড়ির খবর রাখি। যে দিন দেব সব গোপন কথা ফাঁস করে, সে দিন শিরোমণি বিত্তেনিধি সেজকত্তা মেজকত্তা সব্বাইকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দেব। বলি ও দত্ত মশাই, খুব তো দাঁত বার করে হাসছো, নিজের ঘরের এঁড়ে কি করে বেড়ায় তার খবর রাখো ?

ব্যাপার বেয়াড়া হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সকলেই খুব অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। গেনুর কথাবার্তার মধ্যে যে বহু বিপজ্জনক সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে সে কথা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। শ্রীধর কবিরাজ মহাশয় অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহাকে জাপটাইয়া ধরিলেন, বলিলেন,—থামো, গেনু থামো। পাগলামি করো না। বুড়ো পাগল দেখলে লোক তো হাসবেই। এস, বসো, এক ছিলিম তামাক খাও। মাথা ঠাণ্ডা করো ; আর চেঁচিও না।

রাস্তার পাশেই কবিরাজ মহাশয়ের মণ্ডপঘর। গেনুকে টানিয়া আনিয়া তাহার বারান্দায় বসাইলেন। গেনু হুঁকা লইল না ; বলিল—না তোমার ও বামুনের হুঁকো রাখো, আমাকে শুধু কলকেটাই দেও। আমার খাওয়া হুঁকোয় তামাক খেলে তোমার গাঁয়ের বামুনদের আবার জাত যাবে। দরকার নেই বাবা !

তামাক খাইয়া গেনু সত্যই একটু শান্ত হইল। ঈষৎ বিষণ্ণ স্বরে বলিতে লাগিল,—জাত ! দুধের বাচ্চা, কচি শিশু, তার আবার জাত কি, কবরেজ ? এত বড় অবিচার কি ধম্মে সইবে ? আমার আর কি ? আছে তো তিনখানা কাপড় আর একটা চাদর, তা নিজেই না হয় ক্ষারে কেচে নেবো। মাথায় বাবরি রাখবো। দাড়ি কামাতাম, আর না হয় কামাবো না। বছরে দুটো চারটে বিয়ে শ্রাদ্ধর নেমন্তন্ন খেতাম, আর খাবো না। কিন্তু তুই ! তুই হলি গাঁয়ের মাথা—সমাজপতি। এই তোর বিচের হলো ? আমাকে এক-ঘরে করলি ! বেশ, কর ! আমিও তোদের সব্বাইকে একঘরে করলাম। কিন্তু এও বলে রাখছি কবরেজ, মাথার ওপর ভগবান

আকস্মিক আতিশয্যও তাহার নৃত্যের হেতু নহে। সে নাচিতেছিল, কারণ অপরিসীম ক্রোধে সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল; হাত পা ছুড়িয়া তিড়িং মিড়িং করিয়া লাফাইতেছিল আর তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। চটিয়া লাল হইবার তাহার উপায় ছিল না, কারণ তাহার গায়ে প্রগাঢ় তামাটে রঙ আগুনে তাতাইলেও লাল হইবার কথা নহে। লাল হইয়াছিল তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকৃতি চক্ষু দুইটি। ঘন ঘন গঞ্জিকা সেবনের ফলে চোখ তাহার প্রায় সব সময়েই ঈষৎ রক্তাভ হইয়া থাকিত,—ক্রোধের উত্তেজনায় এখন একেবারে জবাকুসুমসঙ্কাশং হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার খর্ব ও স্থূল তনুর একমাত্র অলঙ্কার প্রকাণ্ড লম্বোদরটি থল্ থল্ করিয়া দুলিতেছিল; মুখের ধূম্র-পিঙ্গল ঝাঁকড়া গোঁফ জোড়াটি বাত্যা-বিক্ষুব্ধ উলুখড়ের জঙ্গলের মত আলোড়িত হইতেছিল। সত্যই হাস্যকর দৃশ্য। উপস্থিত সকলেই হাসিতেছিল, আমিও হাসিয়া ফেলিলাম; আনন্দ মণ্ডল হাসিল না।

গেনু সমানে চেঁচাইতেছিল,—ওঃ! ভা-রী আমার সমাজপতি রে! বনগাঁয়ের শিয়াল রাজা! আমি একা মানুষ, মাগ নেই ছেলে নেই, চাল নেই চুলো নেই, দুবেলা দুমুঠো ভাত আর দু-ছিলিম গাঁজা হলেই দিন চলে যায়,—আমার ওপর সমাজপতিত্তো ফলানো হচ্ছে! আমাকে একঘরে করবে!—ধোবা নাপিত বন্ধ করবে!—আমার সঙ্গে কেউ খাবে না!—কর! তো-শালাদের মনে যা আসে সব কর! আমার তাতে কলা হবে,—এই কলা হবে।

দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটি শূন্যে আস্ফালন করিয়া গেনু এক পাক উদ্দাম নৃত্য নাচিয়া লইল। তাহার পর অনর্গল কতকগুলা অশ্লীল গালি কুৎসিত ভঙ্গি সহকারে অনুপস্থিত সমাজপতি শিরোমণি মহাশয়ের উদ্দেশ্যে বর্ষণ করিয়া গেল। তাহার পর নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া আবার চেঁচাইতে শুরু করিল—জাত! জাত দেখাতে এসেছে গেনু চক্কোত্তিকে! বলি জাত আছে কার এই

গাঁয়ে ? সব্বাই-এর হাঁড়ির খবর রাখিয়ে—সব্বাই এর হাঁড়ির খবর রাখি। যে দিন দেব সব গোপন কথা ফাঁস করে, সে দিন শিরোমণি বিদ্যেনিধি সেজকত্তা মেজকত্তা সব্বাইকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দেব। বলি ও দত্ত মশাই, খুব তো দাঁত বার করে হাসছো, নিজের ঘরের এঁড়ে কি করে বেড়ায় তার খবর রাখো ?

ব্যাপার বেয়াড়া হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সকলেই খুব অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। গেনুর কথাবার্তার মধ্যে যে বহু বিপজ্জনক সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে সে কথা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। শ্রীধর কবিরাজ মহাশয় অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহাকে জাপটাইয়া ধরিলেন, বলিলেন,—থামো, গেনু থামো। পাগলামি করো না। বুড়ো পাগল দেখলে লোক তো হাসবেই। এস, বসো, এক ছিলিম তামাক খাও। মাথা ঠাণ্ডা করো ; আর চেঁচিও না।

রাস্তার পাশেই কবিরাজ মহাশয়ের মণ্ডপঘর। গেনুকে টানিয়া আনিয়া তাহার বারান্দায় বসাইলেন। গেনু হুঁকা লইল না ; বলিল—না তোমার ও বামুনের হুঁকো রাখো, আমাকে শুধু কলকেটাই দেও। আমার খাওয়া হুঁকোয় তামাক খেলে তোমার গাঁয়ের বামুনদের আবার জাত যাবে। দরকার নেই বাবা।

তামাক খাইয়া গেনু সত্যই একটু শান্ত হইল। ঈষৎ বিষণ্ন স্বরে বলিতে লাগিল,—জাত! দুধের বাচ্চা, কচি শিশু, তার আবার জাত কি, কবরেজ ? এত বড় অবিচার কি ধম্মে সইবে ? আমার আর কি ? আছে তো তিনখানা কাপড় আর একটা চাদর, তা নিজেই না হয় ক্ষারে কেচে নেবো। মাথায় বাবরি রাখবো। দাড়ি কামাতাম, আর না হয় কামাবো না। বছরে দুটো চারটে বিয়ে শ্রাদ্ধর নেমন্তন্ন খেতাম, আর খাবো না। কিন্তু তুই! তুই হলি গাঁয়ের মাথা—সমাজপতি। এই তোর বিচের হলো ? আমাকে এক-ঘরে করলি! বেশ, কর। আমিও তোদের সব্বাইকে একঘরে করলাম। কিন্তু এও বলে রাখছি কবরেজ, মাথার ওপর ভগবান

আছেন, এখনো চন্দর সুয্যি উঠছে। যেমন আমাকে দুঃখ দিল শিরোমণি ঠাকুর তেমনি দুঃখু ওকেও একদিন পেতে হবে!

আনন্দ মণ্ডল ডাকিল,—চলো, ছোট্‌ঠাকুর।

আবার গিয়ে উঠানে বসিলাম। অর্ধসমাপ্ত চটাটি টানিয়া লইয়া আনন্দ আবার চাঁছিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিল,—তাইতো! ব্যাপারডা বড়ো খারাপ হতি চললো। হরিগুরু! হরিগুরু! পথ দেখাও ঠাকুর!

ব্যাপারটা যে কি তাহা আমরা দুজনেই জানিতাম। গ্রামের সকলেই জানিত, কারণ ঘটনাটি ঘটিয়াছিল মাত্র কয়েকদিন পূর্বে। আর শীঘ্র ভুলিয়া যাইবার মত ঘটনাও তাহা নহে।

নমশূদ্র পাড়ার উত্তরে একেবারে গ্রামের প্রান্তে জগা হাড়ি বাস করিত। জগা ঠিক গ্রামের লোক ছিল না, মাত্র বছর দশেক পূর্বে গ্রামে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছিল। জগার পূর্ব জীবন সম্বন্ধে ধানসোনার কেহই কিছু জানিত না। একটা রহস্যময় অন্ধকারের মধ্য হইতে সে ও তাহার স্ত্রী হঠাৎ একদিন গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। দাশু মিত্তিরের নিকট হইতে বার্ষিক সাড়ে চারি আনা খাজনায় ভিটাটুকু বন্দোবস্ত করিয়া লয় এবং শিরোমণি মহাশয়ের বাঁশঝাড় হইতে দশখানি বাঁশ ভিক্ষা করিয়া ও নদীর ধারের তালগাছগুলি হইতে কিছু তালপাতা সংগ্রহ করিয়া ছোট একখানি কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া ফেলে। তাহার পর হইতে জগা ধানসোনার বাসিন্দা।

গ্রামে আর হাড়ি ছিল না। পাড়ার নমশূদ্রদের সঙ্গেও জগার তেমনি মিলমিশ হইল না,—প্রধানতঃ দুইটি কারণে। নমশূদ্রদের সকলেই ছিল কৃষিজীবী, কিন্তু জগা কৃষিকর্মের ধার দিয়াও গেল না। বাজারের পাশে নদীর ধারে রেলি ব্রাদার্সের প্রকাণ্ড পাটের গুদাম ছিল। সে সেইখানেই সারাদিন 'বেল' বাঁধিত, বোঝা বহিত।

মাঝে মাঝে গ্রামের ভদ্রলোকদের বাড়ীতে কাঠ ফাড়িবার 'ফুরান' লইত। তাহা ছাড়া, সুদক্ষ ঘরামি হিসাবে তাহার একটু সুনাম হইয়াছিল। গ্রামের অধিকাংশ গৃহস্থই খড়ো ঘরে বাস করিতেন, কাজেই এদিক দিয়াও জগার কাজের অভাব হইল না। কৃষাণ-বৃত্তি জগার পছন্দ হইল না, সে মজুর হইয়াই রহিল। দ্বিতীয়তঃ যে স্বাভাবিক ধর্মপ্রবণতা বাংলার নমশূদ্র সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, জগার মধ্যে তাহার বিন্দুবিসর্গও ছিল না। সন্ধ্যাবেলা যখন নমশূদ্র পাড়ায় হরির লুঠ বা সংকীর্তন বা ত্রিনাথের মেলা বা ভাগবত পাঠের আসর জমিয়া উঠিত, জগা তখন বাজার হইতে ফিরিবার পথে একপেট তাড়ি গিলিয়া আসিয়া হয় অন্ধকার ঘরের দাওয়ায় গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিত আর না হয়তো বউটাকে ধরিয়া পিটাইত।

জগার চেহারাব মধ্যে যেমন একটা রুক্ষ বর্বরতা ছিল তেমনি একটা অদ্ভুত উদ্ধত ধরণের সৌন্দর্যও ছিল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ, রক্তাভ গৌরবর্ণ ; কটা চুল, কটা গোঁফ ; নীলাভ ধূসর রঙের চোখ। হঠাৎ দেখিলে তাহাকে হাড়ির ছেলে বলিয়া মনে না হইয়া হাইল্যাণ্ডারের বংশধর বলিয়া মনে হইত। কিন্তু তাহার সর্বশরীরের ও পরিধেয় বস্ত্রাদির অবর্ণনীয় অপরিচ্ছন্নতা, মুখমণ্ডলের নির্বোধ-নিষ্ঠুর ভঙ্গিমা, বুনো শূওরের চোখের চাউনির মত অকারণ ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ দৃষ্টি ও সর্বদা অপ্রসন্ন কোপন স্বভাব যেন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিত,— সে অন্ত্যজ, সে পতিত। আমরা গ্রামের ছেলেমেয়েরা তাহাকে সযত্নে এড়াইয়া চলিতাম। জীবনে কোনদিন আমি তাহার সহিত একটা কথাও কহিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

জগার স্ত্রী ছিল সত্যকার রূপসী। কদর্য পরিবেশ ও অপরিসীম অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে বাস করিয়াও তাহার রূপ কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। তাহার স্বভাবটিও ছিল জগার ঠিক বিপরীত,—হাসিখুসি

রঙ্গরসপ্রিয়। স্বামীর সহস্র উৎপীড়নেও তাহার স্বাভাবিক যৌবন-চাপল্য বিনষ্ট হয় নাই। নমশূদ্র পাড়ায় কানাঘুষা শুনিতাম, জগার বৌ নাকি হাড়ির মেয়ে নহে। ভদ্র-গৃহস্থের মেয়ে কিংবা বৌ। রূপ-মোহের ফাঁদে পা দিয়াই নাকি আজ তাহার এই হাড়ির হাল! ধানসোনা গ্রামেও রূপ-রসিকের অভাব ছিল না। জগার বৌকে ঘেরিয়া শীঘ্রই একদল মধুমক্ষিকা গুঞ্জন শুরু করিয়া দিল,—নাগরালীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। কে হারিল কে জিতিল তাহার সন্ধান আমরা রাখিতাম না।

যখনকার কথা বলিতেছি তখন জগার বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ হইবে। ইতিমধ্যে তাহার সংসারে একটি তৃতীয় প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছিল। একটি পাঁচ ছয় বৎসরের ফুটফুটে মেয়ে কোমরে একখানি ধূলিমলিন ছেঁড়া নেকড়া জড়াইয়া তাহার কুটির-প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়ায়; বাপকে দেখলেই আতঙ্কে কুঁকড়াইয়া মায়েব অঞ্চলতলে আশ্রয় লয়; বাপ কাজে বাহির হইয়া গেলেই ছুটাছুটি দাপাদাপি শুরু করিয়া দেয় কিংবা খেলার সাথীর সন্ধানে পাড়ায় বাহির হইয়া পড়ে। ইহার ফলে জগার আচাব ব্যবহারে কিন্তু বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা দেয় নাই। পূর্বে প্রহারের পাত্রী ছিল একজন, এখন দুইজন হইয়াছে—এই মাত্র।

হঠাৎ একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। জগা বোধ হয় কাহারও নিকট কোন কথা শুনিয়া থাকিবে। সেই দিন সে ঠিক দুপুর বেলা ঘরে ফিরিল। বৌকে সে হাতে নাতেই ধরিয়া ফেলিল কিন্তু পুরুষ মানুষটাকে ধরিতে বা চিনিতে পারিল না। জগার সাড়া পাইয়া সে গামছায় মুখ মাথা ঢাকিয়া বনজঙ্গল ভাঙিয়া দৌড় দিয়াছিল। জগা প্রথমতঃ বৌকে বেদম প্রহার করিল। মেয়েটা ভয় পাইয়া বাড়ী ছাড়িয়া পো'টাক দূরে বাছাড়-বাড়ীতে আশ্রয় লইল। জগার বৌ-এর আর্তনাদ নূতন কিছু ছিল না,—পাড়ার লোক বিশেষ মনোযোগ দিল না। যথেচ্ছ প্রহার করিয়াও কিন্তু

জগার গায়ের ঝাল মিটিল না। সে তখন বৌকে টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল, একটা দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া তাহার হাত পা বাঁধিল, তাহার পর তাহাকে চিৎ করিয়া মাটির উপর ফেলিয়া তাহার গলায় পা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জগার বৌ আধ হাত লম্বা জিভ বাহির করিয়া চোখ উল্‌টাইয়া মরিয়া গেল। তাহার পর জগা ঘরের দরজায় শিকল লাগাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার একটু আগে জগার মেয়ে বাড়ী ফিরিল। ঘরে ঢুকিবার পূর্বে সে ভয়ে ভয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়া ভিতরে একবার উঁকি মারিয়া দেখিল। তাহার পর পাগলের মত চেঁচাইতে চেঁচাইতে আবার পাড়ার মধ্যে ছুটিয়া গেল। শীঘ্রই লোকজন আসিয়া পড়িল; রোমহর্ষক সংবাদ শুনিয়া গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ নরনারী চকিত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইহার পূর্বে যে বাড়ীতে গ্রামের কোন ভদ্রলোক কোনদিন প্রকাশ্যে পদার্পণ করেন নাই, সেখানে আজ প্রকাণ্ড ভিড় জমিয়া উঠিল। ননী চাক্‌লাদারকে তখনই আড়াই ক্রোশ দূরে পরাক্রমপুর থানায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

জগা কিন্তু পলায় নাই। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া সোজা থানায় চলিয়া গিয়াছিল এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। কাজেই ননীকে আর থানা পর্যন্ত যাইতে হইল না। সন্ধ্যার একটু পরেই পুলিশ আসিয়া পড়িল। সঙ্গে জগাকেও লইয়া আসিল; তাহার হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি বাঁধা। এমন দৃশ্য আমরা জীবনে কোনদিন আর দেখি নাই, এমন কাণ্ডও গ্রামে আর কখনো ঘটে নাই। আমাদিগকে শাসন করিবার আর সেদিন কেহ ছিল না। আহার নিদ্রা ভুলিয়া আমরা দল বাঁধিয়া জগার বাড়ীতেই পড়িয়া রহিলাম।

আলাপ-আলোচনা এজাহার-জবানবন্দী শেষ হইতে হইতে রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল। তাহার পর মৃতদেহ বাঁধিয়া ছাঁদিয়া

লইয়া পুলিশের দল থানায় ফিরিয়া গেল ; জগাকে সঙ্গে লইয়া গেল। গ্রামের কয়েকজন মাতব্বরস্থানীয় ব্যক্তিও তাহাদের সঙ্গে গেলেন। আনন্দ মণ্ডল সর্বক্ষণই উপস্থিত ছিল। সে এইবার বলিয়া উঠিল,—তা তো হলো, কিন্তু বাচ্চাডার কি হবে?

তাই তো! মেয়েটার কি হবে? একে খুনী আসামীর মেয়ে, তাহার উপর আবার জাতে হাড়ি! কে তাহাকে আশ্রয় দিবে? ভদ্রলোকদেব তো কথাই নাই, জেলে-মালো নমশূদ্ররাও রাজি হইবে না। তাহারা নিজেরা ছোট জাত হইতে পারে, কিন্তু জাতি-বিচারের আস্ফালনে তাহারা কাহারও অপেক্ষা কম নহে। দেখা গেল মেয়েটা ইত্যবসরে ঘরের দাওয়ার এক কোণে শীতে জড়োসড়ো হইয়া পুঁটুলি পাকাইয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একজন বৃদ্ধা করুণা-বিগলিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—আহা! বাছা বে!

কিন্তু মাত্র করুণায় কোন সমস্যাব সমাধান হয় না। কি করা যায়? এই শীতের রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে খালি বাড়ীতে মেয়েটাকে একা ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়াই বা যাওয়া যায় কি করিয়া? অতি বিব্রত ভাবে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে শিরোমণি মহাশয় বলিলেন,—তাই তো, বড় চিন্তার কথা হলো!

সহসা গেনু চক্রবর্তী আগাইয়া আসিয়া বলিল,—তা তোমরা এখন চিন্তে করতে থাকো। আমি ওটাকে নিয়ে চল্লাম।

শিরোমণি মহাশয় মৃদু প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু গেনু তাহা কানেও তুলিল না। এক ঝট্‌কায় মেয়েটাকে তুলিয়া কাঁধের উপর ফেলিয়া হন্ হন্ করিয়া পুবপাড়ায় নিজের বাড়ীর দিকে রওনা হইয়া গেল।

শিরোমণি মহাশয় একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন,—আজ বোধ হয় নেশার মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গেছে গেনুর।

দুই চারিদিন কাটিয়া গেল। জগার মেয়ে গেনুব বাড়ীতেই

রহিয়া গেল। গেনুর অবশ্য স্ত্রী-পুত্র পরিজন কিছুই ছিল না; একা ঘরে একা বাস করিত; একা রাঁধিত একাই খাইত। কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণ তো! তাহার ঘরে হাড়ির মেয়ে বাস করিবে, এ কেমন ধারা কথা? এত বড় সামাজিক অনাচার নীরবে সহ্য করিবার মত মানসিক ঔদার্য গ্রামের ব্রাহ্মণদের ছিল না। প্রবল ঘোঁট আরম্ভ হইয়া গেল, ইহার একটা বিহিত করিতেই হইবে। শিরোমণি মহাশয় গেনুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; বলিলেন,—সেদিন মেয়েটা খুবই বিপদে পড়েছিল, তুমি দয়া করে ঘরে না নিয়ে গেলে কি যে হতো তা বলতে পারি নে। তুমি যা করেছো তার জন্যে আমি তোমার নিন্দে করছি নে,—নিন্দের কাজ তুমি করো নি। কিন্তু গেনু, সমাজ তো আছে, সমাজের বিধান তো অগ্রাহ্য করা যায় না। বামুনের ঘরে হাড়ির মেয়ে—এ কিছুতেই হতে পারে না। এইবার তুমি ওটাকে ছাড়ো! সামান্য একটা অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্ত করে নিলেই তোমার চলবে এখন। খরচা-পাতি যা লাগে তা না হয় আমিই দেব।

গেনু উত্তর দিল,—সবই তো বুঝলাম, শিরোমণি মশাই। কিন্তু আমি ছাড়লে মেয়েটা যাবে কোথায়? জেঠা জেঠা করে ডাকছে, কেমন একটা মায়াও বসে গেছে। ওর যা হয় একটা আশ্রয় ঠিক করে দিন আপনি, আমি এক্ষুনি পাপ বিদেয় করে দিচ্ছি; তার পর অঙ্গ-প্রাচিত্তির না হয় করা যাবে একটা।

শিরোমণি মহাশয় জগার মেয়ের জন্য কোন উপযুক্ত আশ্রয় স্থির করিতে পারিলেন না, গেনুও তাহাকে ছাড়িল না। ফলে সমাজপতি হিসাবে শিরোমণি মহাশয় তাহাকে একঘরে করিতে বাধ্য হইলেন। তাহার ধোবা নাপিত হুকা বন্ধ হইল, গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজে সে অপাংক্তেয় হইয়া গেল। শিরোমণি মহাশয়ের যে ইহা না করিয়া গত্যন্তর ছিল না, সেকথা গেনু বুঝিল না। গাঁজাখোরের মেজাজ, ক্রোধে অন্ধ হইয়া যাহা নয় তাহা বলিয়া

কতকগুলা কুৎসিত গালিগালাজ করিয়া মানী লোকের অপমান করিয়া গেল।

আনন্দ মণ্ডল আবার বলিল,—দ্যাখো, ছোট্‌ঠাকুর, দ্যাখো—ভালো কাজ করবার জ্বালাডা একবার দ্যাখো। গেন্নু ঠাকুর যে কাজ করেছে, কলিযুগে তার কড়া তুলনা মেলে? শুনেছি স্যায়ং ভগবান রামচন্দর ত্রেতাযুগে গুহক চণ্ডালকে কোল দিছিলেন, আর এই গেন্নু ঠাকুরের কিত্তি দ্যাখলাম সয়চক্ষে। আমি কি জানতাম না যে এডা ভালো কাজ? কিন্তু করতি পারলাম কৈ? ভয় হলো পেরাণে,—সমাজের ভয়, আত্যো-কুটুম্বির ভয়, কতো পেরকার ভয়! গেন্নু ঠাকুর কিন্তু কোন ভয় করলো না, যা ভালো বুঝলো নিভ্‌ভয়ে করে গেল। আমাদের পাপচক্ষি দেখ্‌তি পাই নি, কিন্তু একথা তুমি নিচ্চয় জেনো ছোট্‌ঠাকুর, সেদিন গেন্নু ঠাকুরের মাথার ওপর দেব্‌তারা সগ্‌গো থেকে পুস্‌পো বিষ্টি করেছিলেন। কিন্তু ভালো কাজ তো করলিই হয় না, তার হ্যাপা পোয়ানো বড় শক্ত। এই যে গেন্নু ঠাকুর হাত পা নেড়ে খুব আফালি করে গেল, হ্যান্‌ করবে ত্যান্‌ করবে। কিন্তু ঠাকুরের পেট চলবে কি করে? সেই কথাডা একবার ভেবে দ্যাখো তো!

সত্য কথা। সমাজচ্যুত হইলে গেন্নু চক্রবর্তীর উদরান্নের সংস্থান হওয়া খুবই কঠিন হইয়া পড়িবে। পৈত্রিক সামান্য ভূসম্পত্তির যেটুকু তাহার অবশিষ্ট ছিল তাহা হইতে কায়ক্লেশে তিন মাসের ভাত আসিত। বাকি কয়মাস সে একরূপ উঞ্ছবৃত্তি করিয়াই চালাইত। দত্ত, ঘোষ ও মিত্তির বাবুরা প্রত্যেকে বৎসরে একমাস করিয়া প্রত্যহ ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতেন। সকল বাড়ীতেই গেন্নুর উপর এই ব্রাহ্মণ-ভোজনের রন্ধনের ভার ন্যস্ত হইত। কাজেই বৎসরে তিনমাস তাহার অন্নচিন্তা করিতে হইত না। মধ্যাহ্নে ভূরিভোজন জুটিত এবং অপরাহ্নে ঘরে ফিরিবার সময়

হাতের ঘটিতে গামছা-চাপা দিয়া সেরটাকখানেক ঘন-আবর্তিত দুগ্ধ কিংবা খান দশ পনের ভর্জিত মৎস্যখণ্ড লইয়া আসা চলিত। গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ কাহারও বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকর্ম হইলে রন্ধন-কার্যে সাহায্য করিতে গেন্নুর ডাক পড়িত। অবশ্য তরি-তরকারি ডাল মাছ পায়স প্রভৃতি গ্রামের মেয়েরাই রাঁধিত। গেন্নু রাঁধিত ভাত। উঠানের এক কোণে তাহার জন্য উনান করিয়া দেওয়া হইত। পর পর তিন ছিলিম টানিয়া লইয়া গেন্নু কাজে লাগিয়া যাইত এবং এক হাতে পাঁচ শত লোকের ভাত রাঁধিয়া যেন গালিয়া ভাঁড়ারে তুলিয়া দিত। গৃহকর্তা গাঁজা যোগাইয়া যাইতেন এবং অবশেষে গোপনে গেন্নুর হাতে কিছু দক্ষিণা গুঁজিয়া দিতেন। তাহা ছাড়া সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় গিয়া বাজারের আবগারী দোকানে হিসাবের খাতা লিখিয়া দিয়া আসিত, সেজন্য মাসে সাত সিকা করিয়া পাইত। একার সংসার হইলে কি হয়, খুব টানাটানি করিয়াই চলিত। এহেন গেন্নু চক্রবর্তী হঠাৎ সমাজচ্যুত হইয়া পড়িল। তাহার হাতের ভাত আর গ্রামের কোন ব্রাহ্মণের পাতে দেওয়া চলিবে না। তাহা হইলে তাহার পেট চলিবে কি করিয়া? এখন আবার এক নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। মেয়েটার মুখেও তো দুইবেলা দুই মুঠা ভাত দিতে হইবে!

আনন্দ মণ্ডল কাজ ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল; ঈষৎ বিষণ্ণ স্বরে বলিল,—মনডা বড়ো খারাপ হয়ে গেল, ছোট্‌ঠাকুর। আজ তুমি বাড়ী যাও। বামুনের ছেলে, পুন্নেত্যা লোক, শেষকালে কি না খেয়ে মরবে? তা তো চোখে দেখতি পারবো না। হরিগুরু! হরিগুরু!

দিন কাটিতে লাগিল। গেন্নু চক্রবর্তী মনমরা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। গ্রামের সকলকে একঘরে করিয়া সে যে খুব সুখে আছে সেরূপ মনে হয় না। বুঝা গেল, ভবিষ্যতের চিন্তা তাহাকেও খুব

উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। ইতিমধ্যে শিরোমণি মহাশয় আর একবার তাহাকে গোপনে ডাকিয়া পাঠাইলেন, অনেক বুঝাইলেন। গেনু যে সেদিন তাঁহাকে কুৎসিত ভাষায় কদর্য ভাবে অপমান করিয়া গিয়াছে,—এমন ভাব দেখাইলেন যেন তিনি তাহার কিছুই জানেন না। তাঁহার সদয় ব্যবহারে গেনু কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু নিজের গোঁ ছাড়িল না। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, —আচ্ছা, শিরোমণি মশাই, আমার পাপটা কি হলো একবার বুঝিয়ে দিতে পারেন? বামুনের ঘরের মুখ্যু, পড়াশুনো কিছু করি নি; কিন্তু নাম তো জানি। গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত—কোন্ শাস্তরে আছে যে অনাথাকে অন্ন দিলে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিলে পাপ হয়? আপনি তো অনেক শাস্তর পড়েছেন, আপনিই বলুন। আমি দূর করে দিলে মেয়েটা যাবে কোথায়? এই দারুণ শীতের রাত্তির! বেঘোরে পথে পড়ে মরবে। সেইটেই কি খুব পুন্যিকম্ম হবে?

শিরোমণি মহাশয় বিরস বদনে নীরব হইয়া রহিলেন।

এদিকে আনন্দ মণ্ডল কয়দিন ধরিয়া নমশূদ্রপাড়ার মধ্যে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। প্রায়ই দেখিতে পাইতাম পাড়ার অন্যান্য মাতব্বরদিগের সহিত তাহার গভীর ও গোপন পরামর্শ চলিতেছে তাহার গম্ভীর মুখ ও ব্যতিব্যস্ত ভাবভঙ্গি আমার মনের মধ্যেও কেমন একটা অস্বস্তিকর উদ্বেগের সৃষ্টি করিতে লাগিল। আমাদের লোকসঙ্গীত ও তত্ত্বকথার আসর আর বসে না; সকালবেলাটা নিতান্ত বেকারভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

প্রায় মাসখানেক এই ভাবেই কাটিয়া গেল। হঠাৎ এক দিন সকালে বাড়ী হইতে শুনিতে পাইলাম আনন্দ মণ্ডল আবার গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়াছে। মনটা খুসিতে ভরিয়া উঠিল। একছুটে তাহার নিকট চলিয়া গেলাম এবং নিজের নির্ধারিত তালপাতার চেটাইখানি টানিয়া লইয়া আসন গ্রহণ করিলাম। আনন্দ মণ্ডল

অত্যন্ত প্রশান্ত হাসির সহিত আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল,—বসো ছোট্‌ঠাকুর ; আজ একটা বারমাস্যা গাই, শোন।...........

গেনু চক্রবর্তী-ঘটিত সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। আনন্দ মণ্ডলের মুখেই সব শুনিলাম।

রামকেষ্টপুরের হীরালাল আচার্যি মহাশয় ছিলেন নমশূদ্রের ব্রাহ্মণ। আমাদের গ্রামের আশি ঘর নমশূদ্র সকলেই তাঁহার যজমান। তাহা ছাড়া কাছেপিঠের আরও দুই চারি খানি গ্রামে তাঁহার বহু যজমান ছিল। নমশূদ্রেরা প্রায় সকলেই দরিদ্র, কিন্তু তাহারা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় ধর্মপ্রাণ। তাহাদের প্রত্যেকেরই সংসারে ব্রতপূজাদি অনুষ্ঠান প্রায় সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। কাজেই আচার্যি মহাশয় মাত্র যাজন বৃত্তির সাহায্যেই বেশ বিত্তবান হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিজস্ব কিছু ক্ষেত খামারও করিয়াছিলেন। পাঁচখানা গ্রামের ভদ্রাভদ্র সকলেই তাঁহাকে বেশ মান্য করিত। তাঁহার একমাত্র ছেলে তারণ কিন্তু কাঁচা বয়সেই বিগড়াইয়া গেল। বহু চেষ্টা করিয়াও আচার্যি মহাশয় তাহার অক্ষর-পরিচয় পর্যন্ত করাইতে পারিলেন না, মন্ত্রপাঠ পূজাপদ্ধতি তো দূরের কথা। প্রায় সর্বক্ষণই সে ধানসোনা বাজারে হো-হো করিয়া আড্ডা দিয়া বেড়াইত, বিড়ি ফঁকিত ও সমবয়সী নিষ্কর্মা ছোকরাদের সঙ্গে নানা প্রকার অশ্লীল আলাপ আলোচনা লইয়া থাকিত।

তিন মাস হইল আচার্যি মহাশয় মারা গিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত অবস্থায় তিনি প্রায় ছয় মাস শয্যাগত ছিলেন। রুগ্‌ণ অবস্থায় তিনি নিজে যজমানবাড়ী যাইতে পারিতেন না। পূজাপার্বণ উপলক্ষে একধামা ফুল-তুলসী লইয়া গৃহে বসিয়াই সেগুলি মন্ত্রপূত করিয়া দিতেন ; তারণ ধামা লইয়া যজমানদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিত ও ঘট বা প্রতিমার উপর সেই ফুল-তুলসী নিক্ষেপ করিয়া পূজাকার্য সমাধা করিত। এই ভাবে কাজ চলিত। পিতার মৃত্যুর

পর কিন্তু তারণ একেবারে বাঁকিয়া বসিল। যজমানদের সে সাফ বলিয়া দিল, ঘরে ঘরে ঘণ্টা নাড়িয়া চাল কলা কুড়াইয়া বেড়ানো তাহার দ্বারা পোষাইবে না। সে পৌরোহিত্য করিবে না, বাজারে ঘর ভাড়া লইয়া বিড়িব দোকান খুলিবে।

নমশূদ্রেব দল চক্ষে অন্ধকাব দেখিল। তাহার পর পুরোহিতের অভাবে এই তিন মাস যে তাহাদের কি কষ্টে কাটিয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে পাঁচক্রোশ হাঁটিয়া গিয়া দূর গ্রাম হইতে একরকম জোর করিয়া একজন বামুন ধবিয়া আনিতে হইয়াছে, কর্কশ কথা শুনিতে হইয়াছে, অপমানিত হইতে হইয়াছে, তাহার উপর তিন গুণ দক্ষিণা দিতে হইয়াছে। এত করিয়াও হয়তো একবার যাঁহাকে পাওয়া গেল পরের বাব তিনি আসিলেন না।

পরিস্থিতি যখন এইরূপ সেই সময় গেনু চক্রবর্তী একঘরে হইল। জগার মেয়ের সম্বন্ধে তাহাব মহানুভব আচবণে আনন্দ মণ্ডল একেবাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার ভবিষ্যৎ দূরবস্থাব কথা চিন্তা করিয়া সেই তাই সর্বাপেক্ষা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। অনেক সলা-পরামর্শ আলাপ-আলোচনার পব সে একদিন নমশূদ্র পাড়ার আরও কয়েকজন বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া গেনুব বাড়ীতে গিয়া সরাসরি প্রস্তাবটা করিয়া বসিল।

গেনু প্রথমটা একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিল,—বলো কি, আনন্দ! আমি—সাধুচরণ বেদান্তবাগীশেব নাতি—যাঁব টোলে একদিন পঞ্চাশজন ব্রাহ্মণ-সন্তান শাস্তব পাঠ করতো!—আমি নমশূদ্রেব বামুন হবো! লোকে শুনলে বলবে কি! গায়ে থুতু দেবে না?

আনন্দ মণ্ডল বিনীত ভাবে বলিল,—লোকের কথায় আপনার কি ক্ষেতি হবে, দেবতা? আমরা নমশূদ্দুর—তা সত্যি। কিন্তু আমরাও তো মনিষ্যি! আচাজ্জি ঠাকুর গত হবার পর এই তিন তিনটে মাস আমাদের কি কষ্টে কাটছে, তা তো আপনি সয়চক্ষে দেখতি পাচ্ছেন। আপনারে ছাড়া আর কার কাছে আমাদের

দুঃখুর কথা জানাবো? গেরামে আর আছে কেডা? এই তো সেদিন জগার বাড়ী কাণ্ডটা হয়ে গেল। গেরামশুদ্ধু লোক তো সেখানে ছিল। কিন্তু কৈ? জগার মেয়েডারে তো কেউ কোলে তুলে নিল না! একা আপনিই নেলেন। মনিষ্যির মত হ্রেদয় কয় জনের আছে?

একটু ক্ষোভের হাসি হাসিয়া গেনু বলিল,—কিন্তু আনন্দ, আমার ঘরে হাড়ির মেয়ে রয়েছে। সমাজের বিচেরে তো আমি এক রকম হাড়িই হয়ে গেছি। তা তোমরা তাহলে আমাকে পুরুত বলে মানবে কেন?

জিভ কাটিয়া কপালে জোড়হাত ঠেকাইয়া আনন্দ মণ্ডল বলিল,—অমন কথা উচ্চারণ করবেন না ঠাকুর, শুনলিও পাপ হয়। আপনি হলেন বেরাম্ভন—সত্যিকার বেরাম্ভন—দেব্‌তা। আপনার মধ্যি আগুন আছে; পাপের সাধ্যি কি আপনারে পরশো করে? সব পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর আপনি কিন্তু করবেন না, ঠাকুর। আমরা আশি ঘর লোক—আপনার পায়ের ধুলো হয়ে থাকবো। আপনি আমাদের ওপর নিদ্দয় হবেন না।

গেনু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। তাহার পর বলিল,—তোমরা এখন যাও আনন্দ, আমি একটু ভেবে দেখি।

তাহার পর হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—তোমাদের তেরনাথের মেলায় শুনেছি গাঁজার খুব ছড়াছড়ি পড়ে যায়!—কথাটা সত্যি নাকি?

আনন্দ মণ্ডল সদলবলে উল্লসিত হৃদয়ে পাড়ায় ফিরিয়া আসিল।

পরদিন গ্রামে টি-টিকার পড়িয়া গেল,—গেনু চক্রবর্তী নমশূদ্রের ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছে। সকলে ছি-ছি করিতে লাগিল।

৬

বাবা স্কুলে গিয়াছেন, মা শিশু ভগিনী দুইটিকে ঘুম পাড়াইয়া নিজেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। এ-ই অবসর। বাহিরে শরতের পীতাভ মধ্যাহ্ন-রৌদ্র শ্যামল পল্লীদৃশ্যের উপর পতিত হইয়া কেমন একটা মধুর নির্জনতার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। ঘরের বাহির হইয়া দেখিলাম পোষা মেনি বিড়ালটা দাওয়ার উপর কুণ্ডলি পাকাইয়া ঘুমাইতেছে,—তাহাব সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটা স্বচ্ছন্দ আবাম ও আলস্যের ভাব। সমগ্র গ্রামখানিও যেন অনুরূপ আরাম ও আলস্যের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কোথাও কোন চাঞ্চল্য নাই, কোলাহল নাই।

বাহির হইয়া পড়িলাম। পাড়ার মধ্যে ঢুকিতে ইচ্ছা হইল না। কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে এপথ ওপথ ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলাম। ঊর্ধ্বে চাহিয়া দেখিলাম নীল নির্মেঘ আকাশে গুটি দুই চলমান কৃষ্ণবিন্দু বৃত্তের পব বৃত্ত রচনা করিয়া ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া উঠিতেছে। একটা ঘুঘু ডাকিতেছে। কি অদ্ভুত স্বরক্ষেপণ-কৌশল এই পাখিটার! কাছেই কোথায় বসিয়া ডাকিতেছে, অথচ মনে হইতেছে যেন তাহাব করুণ সুরটি কত দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে! ঘু-ঘুঘু-ঘু। ঘুঘু-ঘু-ঘু! ডাক শুনিতেছি আর মনশ্চক্ষুব সম্মুখে তাহার তালে তালে অপূর্ব গ্রীবাসঞ্চালনের ভঙ্গিটির ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে। পথের পাশে একটা বন-টগরের ছায়ায় বসিয়া একদল ছাতারে পাখি মিটিং করিতেছিল; আমাকে দেখিয়া ছ্যা-ছ্যা-ছ্যাঃ ক্যাচা-ক্যাচ্-ক্যাচ্চাঃ ধ্বনিতে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল। হঠাৎ একটু দূরে বনান্তরাল হইতে একটা দোয়েলের শিস শুনা গেল। জটিল আবর্তের পর আবর্ত রচনা করিয়া সুর-লহরী ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল, মীড় গমক

গিট্‌কিরির ওস্তাদিতে বিমুগ্ধ বনভূমি নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ছাতারের দল পর্যন্ত ছ্যাব্‌লামি থামাইয়া চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

পূজার তখনও দেরি আছে। মিত্তির বাড়ীর প্রতিমার 'একমেটে' হইয়াছে, আর দুই বাড়ীতে মাত্র খড় জড়ানো চলিতেছে। প্রবাসীদের আগমন তখনও শুরু হয় নাই; শারদীয় আগন্তুকদের লোষ্ট্রপাতে গ্রামজীবনের তড়াগ তখনও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে নাই। অনভ্যস্ত উত্তেজনার পূর্ব-মুহূর্তে গ্রাম যেন একটু বেশী করিয়া ঝিমাইয়া লইতেছিল। আমাকে সেদিন বিসের একটা মোহে পাইয়া বসিয়াছিল। নির্জনতাই ভাল লাগিতেছিল, এবং এই নির্জনতাকে আরও নিঃসঙ্গ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে একটা সরু অবলুপ্তপ্রায় পদচিহ্নরেখা ধরিয়া আমি ঘোলভিটার জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ধানসোনা বাজার হইতে ডেলাবোর্ডের যে বড় রাস্তাটি গ্রামের দক্ষিণ দিয়া খাড়া পূর্বদিকে চলিয়া গিয়াছে তাহা ধরিয়া তিন ক্রোশ গেলে বড়-গাঙের খেয়াঘাটে পৌছানো যায়। মধ্যে পড়ে প্রকাণ্ড একটি মাঠ ও ছোট্ট একখানি গ্রাম। নীলা নদীর বাঁক হইতে বাহির হইয়া একটি অতি ক্ষুদ্র জল-ধারা গ্রামের উত্তর-পূর্ব কোণ বেষ্টন করিয়া এই বড়-গাঙে গিয়া পড়িয়াছে। গ্রামের লোক ইহাকে বলিত মরাগাঙ। বৎসরের অধিকাংশ সময় মরাগাঙের খাতে জল থাকিত না; কোন কোন অংশে চাষ আবাদও হইত। বর্ষার সময় দুই একমাস মরাগাঙে স্রোত বহিত। তখন তাহাতে নৌকা চলিত, মাছ ধরার ধুম পড়িয়া যাইত।

এই মরাগাঙের কোল ঘেঁষিয়া নমশূদ্রপাড়া ও দত্তপাড়ার মাঝ-খানে বিরাট ঘোলভিটার জঙ্গল,—ছায়ান্ধকার, দুষ্প্রবেশ্য, রহস্যময় দুই চারিটি সঙ্কীর্ণ শুঁড়িপথ ভিন্ন আগম-নির্গমের উপায় নাই। বেতঝোপ, কণ্টিকারি ও ময়নাড়্যালের দুর্ভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া

ইহার অধিকাংশ স্থানই যেন অজ্ঞাত রহস্যের আবাসস্থল হইয়া রহিয়াছে। রহস্য নিশ্চয় একটা কিছু ছিল। কারণ, রাত্রিকালে দল বাঁধিয়া আলো লইয়াও কেহ ষোলভিটার জঙ্গলে প্রবেশ করিতে চাহিত না। কোন কোন গ্রামবৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি, আজ যেখানে এই জঙ্গল, বহুকাল পূর্বে ধানসোনা গ্রামের আদি বসতি ছিল সেইখানেই। তখন মরাগাঙই ছিল আসল নদী, নীলা তখনও প্রবল হইয়া উঠে নাই। তাহার পর মরাগাঙ মরিয়া গেল, মড়কে ষোলভিটার পত্তন উজাড় হইয়া গেল। নূতন গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে অনেক পরে।

অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছি। পায়ের তলায় ঈষচ্চঞ্চল আলো-ছায়ার জালিকা, আশে-পাশে বন্ধুর-ত্বক্ বৃদ্ধ বনস্পতি-কাণ্ডের স্তম্ভ-সন্নিবেশ, ঊর্ধ্বে শাখা-পল্লব-পত্র সমাবেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রৌদ্রোজ্জ্বল নীলাকাশের আভাস। ঝোপের মধ্যে খড় খড় করিয়া শুকনা পাতা নড়িতেছে। বোধ হয় শিয়াল কি গোসাপ কি বেজি শিকারের সন্ধানে ফিরিতেছে। সাপও হইতে পারে। ত্রস্তভাবে একবার চারিদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া লইলাম। পায়ে-চলা পথটার উপর দিয়া ঘনসন্নিবিষ্ট পিপীলিকা-শ্রেণী চলিয়াছে, যেন একটা রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ জীবন্ত রেখা। হেঁট হইয়া দেখিলাম, তাহাদের অনেকের মুখেই ডিম। তবে কি বৃষ্টি হইবে না কি? একটা প্রকাণ্ড গুব্‌রে পোকা বর্তুলাকৃতি একতাল পচা মাটির উপর সামনের দুটি পা তুলিয়া দিয়া সেটিকে সুকৌশলে ঠেলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। বহু পক্ষীর সম্মিলিত অস্পষ্ট কাকলী মৃদু কলরবের মত কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে। কোথায় কি বুনো ফুল ফুটিয়াছে। স্যাঁৎসেতে মাটির গন্ধের সহিত তাহার অপরিচিত সুবাস মিশ্রিত হইয়া মাথার মধ্যে যেন একটা নেশার ঘোর সৃষ্টি করিতেছে। একটা প্রজাপতি উড়িতেছে ; আলোক-

জালিকার মধ্যে সঞ্চরণশীল পক্ষদ্বয় বিভ্রান্তিকর বর্ণ-বৈচিত্র্য রচনা করিতেছে। সহসা দ্রুত পক্ষ-বিধুননের ছুর্-র্-র্ র শব্দ করিয়া একটা হরিয়াল আমার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া গেল,—ময়ূরকণ্ঠি রঙের বিদ্যুচ্চমক !

হঠাৎ মনে হইল হলুদ-সবুজের হিল্লোল তুলিয়া আমার চক্ষুর সম্মুখে একটা পরদা দ্রুত গুটাইয়া যাইতেছে। একটা নিঃশব্দ বিস্ফোরণে যেন সমস্ত বনভূমি একবার শিহরিয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা একবার ছুর্ ছুর্ করিয়া উঠিল। মনে হইল খুব নিকটেই যেন কি একটা বড়-রকমের ব্যাপার ঘটিয়া গেল। তাহার পর সব চুপ ! নিতান্ত নিষ্কর্মার ন্যায় মাটির দিকে চাহিয়া পথ চলিতেছিলাম। তাই পরিবর্তনটা প্রথম লক্ষ্য করিলাম কানের ভিতর দিয়া। সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সর্বশরীরের ভিতর দিয়া ভীতি ও আনন্দ মিশ্রিত একটা বিচিত্র অনুভূতির শিহরণ খেলিয়া গেল। নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া মাথা হেঁট করিয়া স্নায়ু-মণ্ডলীর সমস্ত শক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়ে কেন্দ্রীভূত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। না—কোথাও কোন শব্দ নাই। বিহঙ্গকূজন পত্রমর্মর সব স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে; বিরাট বনভূমির সমস্ত ছোটখাটো খুস্ খাস্ ধ্বনি সবব্যাপী নৈঃশব্দের প্লাবনে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত যেন শ্বাস রুদ্ধ করিয়া আকুল আগ্রহে কিসের প্রতীক্ষা করিতেছে। বেশ বুঝিতে পারিলাম, চোখ তুলিলেই কি একটা দেখিতে পাইব। বুকের ভিতর হইতে কে যেন ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিল,—সাবধান! সাবধান ! চোখ তুলে চেয়ো না ! পিছন ফেরো ! পালিয়ে যাও !—মন পলাইতে চাহিল, কিন্তু দেহেন্দ্রিয়গণ মনের নির্দেশ মানিল না। চোখ তুলিয়া সম্মুখে চাহিলাম।

দেখিলাম, আমি বনভূমির একাংশ পার হইয়া আসিয়াছি।

আমার সম্মুখে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বিঘা বৃক্ষহীন উন্মুক্ত স্থান— গোলাকৃতি, অরণ্যপ্রাচীর বেষ্টিত। তাহার ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি দীঘি; স্বচ্ছ নির্মল জলে পরিপূর্ণ, কানায় কানায় টলমল করিতেছে। বনপ্রান্তে যেখানে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম সেখান হইতে একটি আঁকাবাঁকা সরু পথ একটি প্রাচীন কিন্তু পরিচ্ছন্ন বাঁধা ঘাট পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এ আমি কোথায় আসিলাম? ঘোলভিটার জঙ্গলের মধ্যে যে এতবড় একটা খোলা জায়গা আছে, এমন সুন্দর দীঘি আছে তাহা তো কোন দিন শুনি নাই। বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার অবকাশ পাইলাম না। কি এক তুর্নিবার আকর্ষণ আমাকে সম্মুখে টানিতে লাগিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গিয়া বাঁধা ঘাটের রানার উপর ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম; তাহার পর চারিদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম।

দীঘির চারিদিকে একেবারে অরণ্য-বেষ্টনীর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র ব্যাপিয়া সতেজ শ্যামল উলুখড়ের তরঙ্গায়িত সমারোহ। কোথাও একটু ফাঁক নাই, অপর কোন তৃণগুল্মের দ্বারা তাহার নিরবচ্ছিন্নতা কোথাও কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নাই। পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, যে পথ ধরিয়া আমি আসিয়াছি তাহার চিহ্নমাত্রও আর দেখা যাইতেছে না। চারিদিকে শুধু উলুখড়ের সমুদ্রে ঢেউ-এর পর ঢেউ উঠিতেছে। সহসা চমকিয়া উঠিলাম। একি! এক বিন্দু হাওয়া নাই কোথাও; দূরে চারিদিকে বৃক্ষ লতার পত্র পল্লবে নিষ্কম্প নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে; সম্মুখে দীঘির জল নিস্পন্দ শিহরনহীন। অথচ উলুখড়ের দলের মধ্যে আলোড়ন-আন্দোলনের আর বিরাম নাই! যে সোনালি রৌদ্রের মায়া আমাকে ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। তাহার পরিবর্তে মলিন ধূসর বর্ণ আকাশ হইতে একটা অপার্থিব পাংশুল প্রভা ঝরিয়া পড়িতেছে। উলুখড় নাচিতেছে, উলুখড় তুলিতেছে, উলুখড় কাঁপিতেছে, উলুখড় সমুদ্র-তরঙ্গের মত উচ্ছ্বসিত

হইয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। মৃদু অথচ সুতীব্র একটানা ধ্বনি কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতেছে—সোঁ—সোঁ—সোঁ—ও—ও! সি—সি—সি—ই—ই। মনে হইল যেন ধ্বনি ও চাঞ্চল্যের এই অবিরাম প্রবাহ ধরণীর অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়া অগনিত উলুখড়ের পত্রে পত্রে সঞ্চারিত হইতেছে।

একটা অনৈসর্গিক আতঙ্ক আমার দেহমন ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। নিষ্পলক নেত্রে উলুখড়ের অবিরাম নর্তনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে হইতে লাগিল যেন আমি সম্মোহিত হইয়া পড়িতেছি। আমাব হাত পা যেন আর আমাব বশে নাই; একটা অলস অজগরের জঠবের মধ্যে আমি যেন জারক রসে ধীরে ধীরে জীর্ণ হইয়া যাইতেছি। আতঙ্ক আছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটা নিশ্চিন্ত বিশ্রান্তির ভাবও আছে, আর আছে একটা অতি বিচিত্র ক্ষীণ আনন্দেব অনুভূতি। এখনই যেন কি একটা ঘটিবে, কি যেন শুনিতে পাইব, দেখিতে পাইব—উৎসুক নিষ্ক্রিয় ভাবে তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি। মনে মনে বেশ বুঝিতেছিলাম, যাহা ঘটিবে তাহা ভয়ঙ্কর একটা কিছু—তাহাব মধ্যে আমার জন্য অমঙ্গলের ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু উপায় নাই। আজ আমাকে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেই হইবে. সেইজন্যই শরতের স্নিগ্ধ শোভায় প্রলুব্ধ করিয়া আমাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে।

উলুখড়ের আন্দোলনের মধ্যে শির্ শির্ করিয়া একটা নূতন সঙ্কেত প্রবাহিত হইয়া গেল। স্তিমিতপ্রায় চক্ষু জোব করিয়া মেলিয়া ধরিয়া দেখিলাম, সেই বিশাল প্রান্তরের সমস্ত উলুখড় চারিদিক হইতে একযোগে আমার দিকে মাথা নোয়াইয়া দিয়া তুলিতে শুরু কবিয়া দিয়াছে। মনে হইল যেন বিস্মৃতির রসাতল হইতে লক্ষ লক্ষ অবলুপ্তপ্রায় প্রাণশক্তি তাহাদেব সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ চেতনার বাহু আমাব দিকে বিস্তাব কবিয়া দিতেছে;—আমাকে

তাহারা আহ্বান করিতেছে, আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে, নিজেদের অস্তিত্বের কথা জানাইয়া দিতে চাহিতেছে। আমাকে কি যেন তাহারা বলিতে চায়!

আমার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া গেল। সর্বাঙ্গ সুবিপুল জড়িমায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু দেহের প্রত্যেকটি স্নায়ু চড়াপর্দায় বাঁধা সেতারের তারের মত রিন্ রিন্ করিয়া কাঁপিতেছে। উলুখড়ের দীর্ঘনিশ্বাসে দুই কান ভরিয়া উঠিতেছে। সোঁ—সোঁ—সোঁ—ও—ও! এসো—এসো—এসো—ও—ও! সি—সি—সি—ই—ই! আছি—আছি—আছি—ই—ই! ধ্বনিকল্লোল ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে উঠিতে লাগিল। আমাকে কেন্দ্র করিয়া যেন একটা অস্পষ্ট কোলাহলের ঝড় বহিতে লাগিল। আড়ষ্ট শরীর ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত মন লইয়া আমি বসিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, আরও না জানি কি হইবে!

হঠাৎ সপ্ করিয়া ঠাণ্ডা লিক্‌লিকে কি একটা জিনিস আমার একটি পা জড়াইয়া ধরিল। অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু চোখ মেলিতে পারিলাম না; একটি আঙুল নাড়িবার সামর্থ্যও শরীরে নাই। এইবার! এইবার! আসিয়া পড়িল! যাহার জন্য এতক্ষণ উৎসুক আতঙ্কে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম এইবার তাহার আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিবার সময় আসিয়াছে। আর একটা! আর একটা! হাতে, পায়ে, বুকে, মুখে, মাথায়! শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ সরীসৃপের বন্ধনে বাঁধা পড়িতে লাগিলাম। টানিয়া নীচের দিকে কোথায় আমাকে তাহারা লইয়া যাইতেছে, উলুখড়ের অতল সমুদ্রে আমি তলাইয়া যাইতেছি। চোখ না মেলিয়াই দেখিতে পাইতেছি, উলুখড়ের জটিল গুচ্ছের অন্তরাল হইতে অসংখ্য পীত-কৃষ্ণ শীর্ণ মুখ ও বিস্ফারিত নিষ্প্রভ চক্ষু উঁকি মারিয়া আমাকে দেখিতেছে, শত শত কঙ্কাল-অঙ্গুলির ইঙ্গিত আমাকে আহ্বান করিতেছে। আরও—আরও নীচে তলাইয়া

যাইতেছি। আর আলো নাই, স্নুনীল অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত হইতেছে, খদ্যোত-স্ফুলিঙ্গ জ্বলিতেছে, নিভিতেছে। তাহার পর আর কিছুই নাই. অবিচ্ছিন্ন কালোর প্লাবনে চেতনার শেষ রশ্মিটুকু পর্যন্ত অস্তমিত হইয়া গেল।

যখন জ্ঞান হইল তখন নিজের ঘরে নিজের শয্যায় শুইয়া আছি। শুনিলাম, জ্বরের ঘোরে ঘর ছাড়িয়া আমি নাকি ষোলভিটার জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া গিয়াছিলাম ও সেখানে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিলাম। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন ; সর্দার পাড়ার বাঞ্ছারাম পলাতকা গাভীর সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে গভীর জঙ্গলের মধ্যে আমাকে দেখিতে পায়। সেই আমাকে কাঁধে করিয়া বহিয়া আনিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছে।

সুস্থ হইয়া উঠিবার পর আমি একদিন আনন্দ মণ্ডলকে আমার অভিজ্ঞতার কথা সব খুলিয়া বলিলাম। শুনিয়া প্রথমে সে বলিল,—ও কিছু না, ছোট্‌ঠাকুর, জ্বরের তাড়সে তুমি কুস্বপ্ন দেখিছিলে। ষোলভিটের জঙ্গলের মধ্যি ওরকম পুষ্কর্নিও নেই কোন খানে, উলুখ্যাড়ের ক্ষেতও নেই। ওরে বলে বিকের। ওসব কথা তুমি আর ভেবো না।

তাহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল,—নামেই শুধু ষোলভিটে ! কম-সে-কম ছ'শো ভিটের শ্মশান আছে ঐ জঙ্গলের মধ্যি। কতো লোক ওখেনে ছিল। কতো হাসি তারা ওখেনে হেসেছে, কতো কেঁদেছে। তারা কি সব চলে গেছে ভেবেছো, ছোট্‌ঠাকুর ? তারা ঐখেনেই আছে। ও জঙ্গলের মধ্যি দিন দুপুরও যা, রাত দুপুরও তাই। ছেলে মানুষ! ওখেনে কি একলা কখনো যেতি আছে !

আনন্দ মণ্ডল সেদিন যাহা বলিয়াছিল আজ আমিও তাহাই

বিশ্বাস করি। সেদিন আমি জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখি নাই, যাহা দেখিয়াছিলাম সত্যই দেখিয়াছিলাম। গ্রামের অতিবৃদ্ধ পিতামহ পিতামহীর দল, যাহারা একদিন ঐখানে ভিটা বাঁধিয়া সুখদুঃখের বেসাতি করিতে বসিয়াছিল, তাহারা একেবারে অবলুপ্ত হইয়া যায় নাই। সেদিন আমি তাহাদেরই অশরীরী আত্মার ক্ষণিক সংস্পর্শ লাভ করিয়াছিলাম, উলুখড়ের মরীচিকার মধ্যে তাহাদেরই অতৃপ্ত কামনার দীর্ঘনিশ্বাস শুনিয়াছিলাম।

তাহারাও আমার গাঁয়ের লোক , তাই তাহাদের কথাও লিখিলাম।

সপ্তমী পূজার সকালবেলা ঠাকুর দেখিতে বাহির হইয়াছি। একা নহি, সঙ্গে আরও পাঁচ ছয়জন বহিয়াছে। এই পূজার সময়টিতে আমরা গ্রামের ছেলেমেয়েরা শারদীয় আনন্দের নানা সুযোগ ও উপলক্ষ সত্ত্বেও নিজেদের বেশ একটু বিব্রত ও বিপন্ন বলিয়া অনুভব করিতাম। গ্রামের পথে ঘাটে নূতন একদল ছেলেমেয়ের উপস্থিতিই ছিল তাহার কারণ। তাহারা পূজার ছুটিতে মাত্র কয়েকদিনের জন্য দেশে বেড়াইতে আসিত, কিন্তু সেই কয়েকদিনের মধ্যেই বেশভূষার পারিপাট্যে, বিদ্যা-বুদ্ধির আস্ফালনে এবং আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তার সুমার্জিত শালীনতায় গ্রামের সমস্ত লোকের মনোহরণ করিয়া লইত। দিনকয়েকের জন্য আমরা একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতাম। হিংসা হইত, ক্রোধ হইত, কিন্তু সবই চাপিয়া যাইতে হইত। কারণ, ইহারা আমাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিত না, চোখে চোখ পড়িলেও এমন অনুকম্পা-মিশ্রিত তাচ্ছিল্যের সহিত চাহিয়া থাকিত যে আমাদের মাথা আপনা হইতেই হেঁট হইয়া আসিত, পলাইয়া আসিবার পথ পাইতাম না।

ইহারই প্রতিবিধানার্থ আমরা পূজার সময় দল বাঁধিয়া ছাড়া বাহির হইতাম না। কারণ দলে ভারী থাকিলে বুকে সাহস থাকে,—অপরের অলক্ষ্যে দুই একটা মুখ-ভেঙচি বা গ্রাম্য গালি বর্ষণ করিয়াও মনের বিষ খানিকটা মিটানো যায়।

দত্তবাড়ী ও মিত্তির বাড়ীর পূজা খুব জাঁকজমকের পূজা। সুতরাং প্রথমে সেই দুই বাড়ী গেলাম, তাহার পর সোজা পশ্চিম-পাড়ায় ঘোষবাড়ী চলিয়া আসিলাম। অবশ্য পূবপাড়ায় ঘোষাল বাড়ীতে ও মাঝের পাড়ায় শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ীতেও

পূজা হয়। কিন্তু সে পূজা অতিরিক্ত মাত্রায় সাত্বিক ধরণের, একান্ত নিবাড়ম্বর। শিরোমণি মহাশয় তো প্রতিমাও করেন না, ঘটস্থাপনা করিয়াই কাজ সারেন। ওরূপ নিরামিষ পূজা আমাদের পছন্দ হয় না।

অবশ্য দত্ত ও মিত্তির বাড়ীর তুলনায় ঘোষবাড়ীর পূজাও উৎসব-সমারোহে অনেকখানি খাটো। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, জমিদার হিসাবে ঘোষবাবুদের তখন পড়ন্ত দশা। কতকগুলি বড় বড় মামলায় জড়াইয়া পড়ায় সামর্থ্যাতীত অর্থব্যয় করিতে হয় এবং তাহারই ফলে বাকী খাজনার দায়ে তিন চারিটি বিশেষ লাভজনক মহাল নিলাম হইয়া যায়। এখন যাহা আছে তাহাতে কোনক্রমে ঠাট বজায় রাখিয়া চলা যায় মাত্র। রক্ষা এই যে স্থানীয় হাটটির মালিকানা ঘোষবাবুদের, নগদ আদায় বেশ ভালোই হয়, দৈনন্দিন জীবনে অভাবের পীড়ন এখনো সহ্য করিতে হয় নাই।

কথায় বলে, মরা হাতী লাখ টাকা। হাজার হউক জমিদার বাড়ীর পূজা, তাহার ধরণই আলাদা। তাহা ছাড়া, লক্ষ্য করিলাম, এবার যেন ঘোষবাবুদের বাড়ীতেও একটু উপচার-আয়োজনের বাহুল্য করা হইয়াছে। সপ্তমীতে তিনটি পাঁঠা বলি দেওয়া হইয়াছে, আরও নয়টি বাঁধা রহিয়াছে, অষ্টমীতে চারটি পড়িবে, নবমীতে পাঁচটি। অন্যান্যবার দৈনিক একটি করিয়া পড়িয়া থাকে। শুনিলাম, জমিদারির সমস্ত প্রজা নিমন্ত্রিত হইয়াছে, তাহারা তিনদিনই খাইবে।

পূজামণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তুলনামূলক শিল্প-সমালোচনায় মাতিয়া উঠিয়াছি এমন সময় দেখিতে পাইলাম আট দশ বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে রঙীন সিল্কের ফ্রক পরিয়া এক মাথা কোঁকড়া চুল দুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেখিয়াই দলশুদ্ধ চমকাইয়া উঠিলাম,—এইরে, সারিয়াছে! এখানেও একটা আসিয়া জুটিয়াছে! এখনই হয়তো নাকিসুরে গান গাহিতে কি আধো-আধো কণ্ঠে

কবিতা আবৃত্তি করিতে কি পটাপট্ মানসাঙ্ক কষিতে আরম্ভ করিয়া দিবে। সবাই মিলিয়া বাহবা দিতে থাকিবে, আর আমরা দাঁড়াইয়া অপদস্থ হইব। সরিয়া পড়িব কি না ভাবিতেছি, হঠাৎ আমাদের উপর তাহার নজর পড়িল। তৎক্ষণাৎ এক ছুটে সে একেবারে আমাদের দলের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর অনর্গল বকিতে শুরু করিয়া দিল।

—হ্যাঁ ভাই, তোমরা কোন্ পাড়ায় থাকো? আমাকে তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে নিয়ে যাবে? আমি এর আগে আর কখ্খনো পাড়াগাঁয় আসিনি। সত্যি, পাড়াগাঁ আমার খুব ভালো লাগছে। কতো গাছ, ফুল, পাখি; মাঠ! কি সুন্দর নদী! আমরা কাল সকালে এসেছি, কিন্তু কেউ আমাকে একটু বেড়াতে নিয়ে যায় নি। সক্কলের নাকি খুব কাজ! পূজোবাড়ী কি না —তাই। তোমাদের গ্রামে নাকি পাঁচখানা পূজো? আমি শুধু এই একখানা ঠাকুরই দেখেছি। আমাকে তোমরা ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাবে?—যাবে ভাই? মাকে বলে আসবো?—আজ পাঁঠা বলি দেখলাম। আর কখ্খনো দেখি নি। উঃ! কি রকম ব্যা ব্যা করে ডাকে! আর কতো রক্ত!—খেলা করবে? এসো না আমরা সবাই মিলে কানামাছি খেলি।

মেয়েটা তো মন্দ নয়! তাহার পরিধানে সিল্কের জামা, মাথায় টুকটুকে লাল রেশমী ফিতা কেমন কায়দা করিয়া ফাঁস দিয়া বাঁধা; কিন্তু কৈ সে তো আমাদের কোরা তাঁতের ধুতি ও শাদা জিনের কোট লইয়া কোন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিল না! আমাদের মাথার চুলের বিশ্রী খোঁচা খোঁচা কদমছাঁটও যে সে লক্ষ্য করিয়াছে এমন তো মনে হইল না! সাগ্রহে রাজি হইয়া গেলাম। খেলা শুরু হইল।

তাহার পরিচয় পাইতেও বেশী দেরী হইল না। মাত্র মাস চার পাঁচ পূর্বে তাহার দাদার সহিত ঘোষবাড়ীর সেজকর্তার ছোট

মেয়ে পার্বতীর বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের কথা অবশ্য আমাদের সকলেরই মনে ছিল ; জমিদারবাড়ীর নিমন্ত্রণ অত সহজে ভুলিয়া যাওয়া যায় না। তাহার বাবা নাকি 'জজ্' ছিলেন, এখন 'রিটায়ার' করিয়াছেন। তাহারা কলিকাতাতেই থাকে, দেশঘর কিছু নাই। সেজকর্তার নিমন্ত্রণে পূজা দেখিতে আসিয়াছে। তাহার দাদা আসে নাই, নূতন বৌদিকে লইয়া দার্জিলিং পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছে। তাহার বাবারও নাকি আসিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না।

--বাবা বললে, হুঁঃ! ভারী তো অজ পাড়াগেঁয়ে জমিদার! তাও তো শুনেছি সম্পত্তি সব খুইয়ে বসে আছে,—নিলেম রদ করবার টাকা পর্যন্ত নেই। হাটের তোলা তুলে খায়। কি করতে যাবো সেখানে? মরতে?—মা বললে, না, নতুন কুটুম্ব, আদর করে ডেকেছে, না গেলে ভালো দেখাবে না। তা ছাড়া, নেলিটা জন্মে অবধি বাংলাদেশের পাড়াগাঁ কাকে বলে তা দেখলো না,—খালি পুরী আর দার্জিলিং, দার্জিলিং আর পুরী। চলো এবার শানসোনাতেই যাবো।

মেয়েটার নাম নীলিমা, ডাকনাম নেলি। এখানে আসিয়া বেশ বিপদেই পড়িয়া গিয়াছে। একে তো সে শুধু প্রবাসিনী নহে, বিদেশিনীও বটে; তাহার উপর আবার ঘোষবাবুদের বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়ের একান্ত অভাব। আমাদের একেবারে পাইয়া বসিল। অনেকক্ষণ খেলা চলিল। তাহার পর কাল সকালে আবার আসিয়া তাহাকে লইয়া প্রতিমা দেখিতে বাহির হইব—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সবেমাত্র ঘরে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় কাছারিবাড়ীতে কিসের একটা সোরগোল শুনিয়া সকলে মিলিয়া সেখানে ছুটিয়া গেলাম।

গিয়া দেখিলাম, কাছারি ঘরের বারান্দায় একটা আধবুড়া লোক উবু হইয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে, আর ভিতরে ফরাসের উপর গড়গড়ার নল হাতে করিয়া নগ্নগাত্রে তাকিয়া ঠেস

দিয়া অর্ধশয়ান সেজকর্তা তাহাকে মনের সাধ মিটাইয়া গালি দিতেছেন। সেজকর্তার পাশে ফরাসের উপর একজন সৌম্যদর্শন সুবেশধারী প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিব্রত গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। নেলি চিনাইয়া দিল, উনিই তাহার বাবা।

সেজকর্তার মুখের বিরাম ছিল না,—পাজি, ছুঁচো, হতভাগা কোথাকার! একেবারে সাপের পাঁচ পা দেখেছো,—না? জমিদার কি মরে গেছে ভেবেছো? জুতিয়ে লাশ করে দেবো, জানো না? তিন তিন সনের খাজনা বাকি! অথচ ব্যাটার টিকিটি দেখতে পাবার যো নেই! ব্যাটা আমার নবাব পুত্তুর হয়েছেন! মাসে মাসে এত্তেলা পাঠাচ্ছি, পাইক-পেয়াদা হেঁটে হেঁটে হয়রান হয়ে গেল, ব্যাটার দেখাই নেই! আর আজ এসেছেন নেমন্তন্ন খেতে? দাঁড়াও, তোমাকে ভাল করে নেমন্তন্ন খাওয়াচ্ছি।

হাতের গড়গড়ার নলটি ফরাসের উপর আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া সেজকর্তা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। লোকটা একবার ক্ষীণ কাতর-কণ্ঠে কিছু বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সেজকর্তার প্রচণ্ড ধমক খাইয়া হতভম্ব হইয়া চুপ করিয়া গেল।

—চোপরাও, শূয়ারকা বাচ্চা! আবার কথার ওপর কথা!

তাহার পর পিছন দিকে একটু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—দেখুন তো নেউগি মশায়, চাঁচড়ির নিমাই পরামানিকের নামে কতো টাকা বকেয়া পড়েছে?

গোমস্তা হরিহর নিয়োগী মহাশয় পিছনে ফরাসের এক কোণে বসিয়া গভীর মনোনিবেশ সহকারে খাতা লিখিতেছিলেন। দুই একবার খাতার এপাতা ওপাতা উল্টাইয়া গলা ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন,—আজ্ঞে, সালিয়ানা দু'টাকা পনের পয়সা হিসাবে তিন বছরে পাওনা হলো গিয়ে ধরুন ছ'টাকা স'ওগাবো আনা, আর তাগাদার পেয়াদার রাহাখরচ আর রোজ-খোরাকী বাবদ এক টাকা

পৌনে তের আনা—মোট সাড়ে আট টাকা। সুদের হিসেব এখনো করা হয় নি।

সেজকর্তা রুষ্ট হাসি হাসিয়া কহিলেন,—হুঁ:! সুদ! আসল কোথায় পড়ে থাকলো তার ঠিকানা নেই, আপনি দেখছেন সুদ!

তাহার পর গলা চড়াইয়া হাঁক দিলেন,—লখাই!

বৃদ্ধ লখাই সর্দার নিকটেই ছিল, অগ্রসর হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সেজকর্তা অবশ্য বড় গলায় পাইক-পেয়াদার আস্ফালন করিতেছিলেন, কিন্তু আমরা জানিতাম, পাইক বলো পেয়াদা বলো, ঘোষবাবুদের থাকিবার মধ্যে আছে ঐ সবেধন নীলমণি লখাই সর্দার। সে-ই হাতে লাঠি লইয়া মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া ঘরে বাহিরে তাঁহাদের জমিদারির মান বজায় রাখিত। বৃদ্ধ, রুগ্ণ, কুব্জদেহ হইলে কি হয়, উৎসাহ ও আড়ম্বরের তাহার অভাব ছিল না,—কারণে অকারণে যখন তখন হাঁক-ডাক ছাড়িয়া প্রমাণ করিতে চাহিত যে ঘোষবাবুদের পুরাতন প্রতাপের উত্তাপ বর্তমানে অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও একেবারে নিভিয়া যায় নাই।

সেজকর্তা ফরাসের নীচে হইতে নিজের একপাটি চটি-জুতা তুলিয়া লইয়া লখাই-এর দিকে ছুড়িয়া দিয়া হুকুম করিলেন,—মার ব্যাটাকে; মালিকের খাজনা ফেলে রাখার মজাটা ভালো করে বুঝিয়ে দে। টাকা প্রতি এক ঘা—গুণে গুণে মার।

লোকটা আর্তনাদ করিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িল এবং হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হুজুরের নিকট নিজের দারিদ্র্যের কথা ও খাজনা দিবার একান্ত অক্ষমতার কথা নিবেদন করিতে লাগিল। লখাই সর্দার চটির পাটিটি হাতে লইয়া তাহার পিঠের উপর পটাস্ করিয়া এক ঘা মারিল। চাহিয়া দেখিলাম, বিস্ময়ে ও ভয়ে নেলির মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, চোখ দুইটা বড় বড় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বাবার মুখের অবস্থাও অবর্ণনীয়। আমরাও কম অবাক হই নাই। একি কাণ্ড! জমিদারি অনেক দেখিয়াছি।

অমন যে দোর্দণ্ড-প্রতাপ মিত্তির বাবুরা দত্তবাবুরা, তাঁহাদিগকেও তো এমন ভাবে প্রজা ঠ্যাঙাইতে কখনো দেখি নাই!

পটাপট্ জুতার ঘা পড়িতে লাগিল। লোকটা আর চেঁচাইতেছিল না, চুপ করিয়া প্রহার সহ্য করিতেছিল। আমরা রুদ্ধ-নিশ্বাসে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম ও আঘাতেব সংখ্যা গণনা করিতেছিলাম। সাড়ে আট টাকাব 'সাড়ে' অংশটি লখাই সর্দাব কি উপায়ে পবিশোধ করে তাহা দেখিবাব জন্য একটা অদম্য কৌতূহলও অনুভব করিতেছিলাম। দেখিলাম, এসকল ব্যাপাবে লখাইকে শিখাইবার কিছু নাই। আট ঘা পিঠে মারিবার পর সে জুতাব অগ্রভাগ দিয়া লোকটার মাথায় একটা প্রবল ঠোক্কব মারিল। বুঝিলাম, আট আনাও উশুল হইল।

প্রহাব-পর্ব শেষ হইলে সেজকর্তা পুনরায় হুকুম দিলেন,—যা, ব্যাটাকে কান ধবে নিয়ে গিয়ে গাবদ ঘবে আটক কবে বাখ। আব বাড়ীতে ওর ছেলের কাছে একটা খবব পাঠিয়ে দে। কড়ায় গণ্ডায় খাজনা মিটিয়ে দিয়ে গেলে তবে খালাস পাবে।

ঘবে ফিবিলাম, কিন্তু বিস্ময়েব ঘোবটা কাটিল না। গাবদ ঘব! সে আবাব কোথায়? কাছাবি চণ্ডীমণ্ডপ হইতে আবম্ভ কবিয়া নদীব ধাবেব খিড়কিব দবজা পর্যন্ত ঘোষবাড়ীব গলি-ঘুঁজি সবই আমাদেব চেনা। কিন্তু গাবদ ঘব তো কোথাও দেখি নাই! কোন দিন নাম পর্যন্ত শুনি নাই।

বৈকাল বেলা আবাব একবাব ঘোষবাড়ীতে গেলাম, কিন্তু নেলিব দেখা পাইলাম না। দেখিলাম, বাহিবেব প্রাঙ্গণে প্রজাভোজন চলিতেছে। চিড়া মুড়কি দৈ চিনিব ফলার,—ভোজনেব আওয়াজে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ঘুবিয়া ঘুবিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছি, সহসা এমন একটি দৃশ্য দৃষ্টিগোচব হইল যাহাতে পুনবায় অর্থাৎ তৃতীয় বাব বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। প্রজাভোজনেব পংক্তি সমূহ হইতে বেশ একটু দূবে একটা ঝাঁকড়া

কামিনী ফুলের গাছের আড়ালে চাঁচড়ির নিমাই পরামানিকও ফলারে বসিয়া গিয়াছে। তাহার কোমরে একখানি নূতন লাল গামছা জড়ানো, মাথায় একখানি নূতন কোরা ধুতি পাগড়ির মত করিয়া বাঁধা, মুখে পরম পরিতৃপ্তির হাসি। নিকটেই লখাই সর্দার লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে নিম্নস্বরে যে আলাপন চলিতেছিল তাহা ঠিক কয়েদী ও প্রহরীর মধ্যে যেরূপ আলাপন প্রত্যাশা করা যায় সেরূপ বলিয়া মনে হইল না। কারণ কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে দুইজনই হাসিয়া খুন হইতেছিল। রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিত।

পূজা মিটিয়া গেলে একদিন দুপুরবেলা লখাই সর্দারকে একান্তে পাইয়া চাপিয়া ধরিলাম, ব্যাপারটা কি বলিতেই হইবে। ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, সেও কথাটা কাহাকেও না বলিতে পাইয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। বেশী পীড়াপীড়ি করিতে হইল না।

লখাই বলিল,—ওটা একটা লাটোক হলো, বুঝলে না দাদাঠাকুর? যেমন হরিশচন্দোর লাটোক হয় যাত্রায়, চাঁদ সদাগরের লাটোক হয় মনসার ভাসানে, তেমনি এও একরকম লাটোক! —জমিদারির লাটোক বলতি পারো এরে। আসল কথাডা জানি মাত্তর আমরা তিনজন, সেজকত্তা স্যায়ং, আমি, আর ঐ নিমাই পরামানিক। নেঁউগি মশাই পজ্জন্ত ভেতরের খবর কিচ্ছু রাখেন না। কথাডা কি জানো?—ঐ যে সেজকত্তার নতুন বেয়াইমশাই, উনি ছেলেন মস্ত বড়ো চাকুরে। চাকুরে বাবুদের ধম্মো তো জানোই, জমিদারদের মোটে গেরাহ্যির মধ্যিই আনতি চান না। তার ওপর আবার জানতি পেরেছেন যে বাবুদের অবস্থা তেমন ভালো না আজকাল, মহাল টহাল সব নিলেম হয়ে গেছে, ঐ হাটই একমাত্তোর ভরসা। সেই জন্যি নাকি বড়ো তুচ্ছু-তাচ্ছিল্যি করেন, খারাপ কথা-টথাও বলেন। সেজকত্তার

কানে এসিছিল কথাডা। তিনি একদিন আমারে ডেকে বললেন, —লখাই, এই ব্যাপার। নতুন কুটুম্ব, সে যদি এমন করে মান-মজ্জেদার খোয়াব করে, তা হলি তো মুখি চুনকালি পড়বে। এর তো একটা বিহিত করতি হয়!—এই! এই হলো ব্যাপাবডা। এই জন্যিই এতো আয়োজন—এতো পাঁটাবলির ধুম, এতো পেরজা-ভোজনেব হুড়োহুড়ি। কলকেতাব কুটুম্বিরি ডেকে এনে ছ্যাখাতি হবে, জমিদার কারে বলে, জমিদারি কারে বলে! কিন্তু মাত্তোর ঐশ্বজ্জি ছ্যাখালিই তো চলবে না, পেবতাপডাও তো দেখানো চাই! তাই ঐ নিমেডারে ধবে এনে কবে দেওয়া গ্যালো একটা লাটোক বেয়াইমশায়ের সামনে। দেখে যান কলকেতাব বাবু জমিদারের পেবতাপ কেমন জিনিস! নিমে ব্যাটা পেরথমডা বাজি হতি চায় নি। সাধ করে মাব খেতি আব কেডা সহজে বাজি হয়, দাদাঠাকুর? তবে কি জানো! লোভ বড়ো জিনিস, লোভে পড়ে মানুষ সব করতি পাবে। আর তা ছাড়া মজাডাই কি কম হলো? আমি করলাম জুতোমাবাব লাটোক, আব নিমে কবলো মড়াকান্নার লাটোক। কলকেতাব চাব্‌বে বাবু চক্ষু ছ্যানাবড়া করে কলকেতায় ফিবে গ্যালেন।

একটু খানি চুপ করিয়া থাকিয়া লখাই আবার বলিল,—অবিশ্যি খবচা হয়ে গ্যালো বেশ কিছু। খাজনা মকুব বাবদ গ্যালো সাড়ে আট টাকা, একখানা ধুতি আঠাবো আনা, আর একখানা গামছা সেও কোন না পাঁচ গণ্ডা পয়সা। আব তা ছাড়া গারদ ঘরেব নাম কবে দেলেন তো ব্যাটাবে আমাব কুঠবিতে পাঠিয়ে। সেখানে বসে বসে ব্যাটা কম-সে-কম আট দশ ছিলিম তামাকও পুড়িয়ে গেছে। যাই হোক, তবু মজ্জেদা তো বজায় থাকলো!—দেখো দাদাঠাকুর, বিশ্বেস কবে তোমাবে কথাডা বললাম, আব কাউবি বলো না যেন।

কিন্তু এমন মজাব কথা কি পেটেব মধ্যে চাপিযা বাখা যায়?

শীঘ্রই সমস্ত গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল,—লোকে কয়েকদিন খুব হাসাহাসি করিল।

ব্যাপারটার মধ্যে যে বেশ খানিকটা হীনতা ও গ্লানি আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আধুনিক রাজনৈতিক প্রবন্ধের ভাষায় ইহাকে মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির একটা বর্বর নিদর্শন হিসাবেও গণ্য করা যায়। আবার কাব্যরসিকের দরদী মন লইয়া বিচার করিলে ইহার মধ্যে করুণ রসের আভাসও যে পাওয়া যায় না এমন নহে। কিন্তু আমার মনের নিকট সমগ্র ঘটনাটা এখনো একটা মজার কথাই হইয়া রহিয়াছে। যখনই সেদিনের কথা ভাবি তখনই আমার হাসি পায়। নিমাই পরামানিক নিজেও হাসিয়াছিল।

যে কাহিনীটি আজ বলিতে বসিয়াছি ঘটনা-পরম্পরার একটানা সূত্র ধরিয়া তাহা কোনদিন আমার নিকট উদ্ঘাটিত হয় নাই। শ্রুতি, স্মৃতি ও অনুমানের নানা বিশ্লিষ্ট টুকরা একত্র সমাবেশ করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল। পল্লীসমাজে কোন কথাই বেশী দিন গোপন থাকে না, স্বাভাবিক নিয়মেই ব্যষ্টির সুখ-দুঃখ সমষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই কাহিনীটির কোন কোন অংশ বহু দিন সাধারণের অবিদিতই রহিয়া গিয়াছিল। যে অংশটি জানিতে পারিয়াছিলাম সকলের শেষে, সেইটি দিয়াই কাহিনী আরম্ভ করিতে হইতেছে।

শিবচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় প্রাত্যহিক দিবানিদ্রা সমাপন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া যখন বারান্দায় একখানি চৌকি চাপিয়া বসিলেন তখন বেলা গড়াইয়া গিয়াছে। রান্নাঘরের পিছনে দুইটি দীর্ঘ নারিকেল বৃক্ষের শীর্ষপত্রে পড়ন্ত রৌদ্রের রক্তাভ দীপ্তি ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। শিবচরণ অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন ; তাহার পর ডান হাতে তুড়ি দিতে দিতে সশব্দে একটা হাই তুলিলেন। হাই-এর দীর্ঘচ্ছন্দিত অব্যক্ত ধ্বনির জের টানিয়া আলস্য-গদ্‌গদ-কণ্ঠে ইষ্টদেবীর নাম স্মরণ করিলেন,—তারা! তারা! তাহার পর একটু গলা চড়াইয়া হাঁক দিলেন,—বাসু, এক গ্লাস জল দিয়ে যা তো মা!

সংসারের কাজকর্ম শেষ করিয়া হবিষ্য সারিতে সারিতে বাসুর প্রায় রোজই অনেক বেলা হইয়া যাইত। কাজেই সে বড় একটা দিনে ঘুমাইত না। আজও ঘুমায় নাই, তবে বিছানায় পড়িয়া একটু গড়াগড়ি দিয়া লইতেছিল। পিতার আহ্বান শুনিয়া ধড়মড়

করিয়া উঠিয়া বসিল এবং যথাসম্ভব সত্বর জলের গ্লাস হাতে লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাসু ওরফে বাসন্তী শিবচরণের বিধবা কন্যা। শিবচরণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। অক্ষরে অক্ষরে শাস্ত্রের অনুজ্ঞা পালন করিয়া গৌরীদানের অক্ষয় পুণ্য অর্জন করিতে তিনি ভরসা পান নাই বটে কিন্তু একে একে তিনটি মেয়েরই যখন তিনি বিবাহ দিয়াছিলেন তখন তাহাদের কাহারও বয়স এগার পূর্ণ হয় নাই। পুণ্যলাভ তিনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা এই দু'জনেই তাহার সুফলের সবটুকু ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছিল। তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে স্বামী-পুত্র-কন্যা লইয়া যে যাহার শ্বশুর বাড়ীতে সংসার করিতেছিল। বাসুর ভাগ্যে কিন্তু পিতৃ-পুণ্যের ছিটাফোঁটাও জুটিল না। বিবাহের পর দুই বৎসর কাটিতে না কাটিতেই সে বিধবা হইয়া বাপের বাড়ী আসিয়া উঠিল।

বাসুর বয়স এখন বাইশ তেইশ বৎসর। বিধবা হইলেই মেয়েদের কপাল পুড়িয়া যায় একথা গ্রামের সকলেই বিশ্বাস করিত এবং ইহাও প্রত্যাশা করিত যে কপালই যখন পুড়িল তখন দেহও পুড়িয়া খাক হইয়া যাইবে। বিধবার রূপ-যৌবন সংসার ও সমাজ দুই-এর পক্ষেই সমান অকল্যাণকর। কিন্তু শিবচরণের সংসার ও ধানসোনার সমাজ কোনটির উপরই যে বিধাতার বিশেষ মমতা আছে এরূপ মনে হইল না। কারণ, বিধবা বাসুর বয়স যত বাড়িতে লাগিল তাহার দেহও তত লাবণ্যের প্লাবনে কূলে কূলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। বৈধব্যের বহ্নিতাপ সেই প্লাবনের মুখে কবে যে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল তাহা সে নিজে বুঝিতেও পারিল না। বালিকা বয়সে বাসুকে লোকে মোটামুটি সুশ্রী মেয়ে বলিয়াই জানিত। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেদিন তাহার সর্বশরীরে অপরূপ সৌন্দর্যের সমারোহ জাগিয়া উঠিল সেদিন গ্রামের লোক একেবারে সচকিত হইয়া উঠিল। এ বাসু যেন আর সে বাসু নয়!

পল্লীপ্রাঙ্গণের সেই শ্যামা লতিকাটি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে,—তাহার পরিবর্তে দেখা দিয়াছে খড়্গের ন্যায় শাণিত, বহ্নি-শিখার ন্যায় প্রদীপ্ত জাগ্রত যৌবনশ্রী।

এত বড় একটা কাণ্ড যে ঘটিয়া গিয়াছে শিবচরণ বোধ হয় তাহার কিছুই জানিতেন না। তিনি বিষয়ী মানুষ, প্রচুর জমি-জমার মালিক, ক্ষেত-খামার চাষ-আবাদ লইয়াই থাকিতেন। কন্যার বৈধব্যে পিতার দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। দুঃখিত তিনিও নিশ্চয় হইয়াছিলেন। কিন্তু সে বহুদিনের কথা, সে দুঃখের স্মৃতি আর তাঁহার মনে বিশেষ অবশিষ্ট ছিল না। ইদানীং বরং মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত, বিধবা মেয়েটা সংসারে থাকাতে তাঁহার বিলক্ষণ সুবিধাই হইয়াছে।—ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। তাঁহার একমাত্র পুত্র বাণীকুমার চাকুরী উপলক্ষে সস্ত্রীক বিদেশেই বাস করে। গৃহিণী বাতরোগগ্রস্তা, অপটু হইয়া পড়িয়াছেন। একা বাসুই সংসারটা মাথায় করিয়া আছে। সে না থাকিলে এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িতে হইত।

মেয়ের হাত হইতে জলের গ্লাসটি লইতে গিয়া হঠাৎ শিবচরণের দৃষ্টি বিস্রস্তবসনা বাসুর আংশিক অনাবৃত বক্ষের উপর পতিত হইল। তখনো বিধবা মেয়েদের, অন্ততঃ পল্লীগ্রামের বিধবা মেয়েদের, সেমিজ ব্লাউজ পরার প্রথা প্রচলিত হয় নাই। শিবচরণ দেখিলেন বাসুর যৌবনপরিপুষ্ট বক্ষের উপর সুস্পষ্ট নখর-চিহ্নের দীর্ঘ রক্তরেখা। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

বাসু জল দিয়া চলিয়া গেল। শিবচরণ জলের গ্লাস হাতে করিয়া বহুক্ষণ ভূতগ্রস্তের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। কথামালার একচক্ষু হরিণের ন্যায় আঘাতটি তাঁহার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল একটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত দিক হইতে। তিনি নিতান্ত অসহায় বোধ করিতেছিলেন। তাইতো! একি হইল? ঠিক্ করিয়া

জলশুদ্ধ গ্লাসটা মাটির উপর রাখিয়া তিনি উঠিয়া পুনরায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণীর সহিত একবার পরামর্শ করা প্রয়োজন।

আরও কিছুক্ষণ পরে শিবচরণ বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়া সদর ঘরের দাওয়ার উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অন্যদিন এই সময়টিতে তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়া থাকেন। মিত্তির বাবুদের কাছারি বাড়ীতে ও শিরোমণি মহাশয়ের বৈঠকখানায় যে দুইটি বৈকালিক আড্ডার অধিবেশন হয় তাহার একটিতে বা অপরটিতে নিয়মিত হাজিরা দেওয়া তাঁহার প্রাত্যহিক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আজ তাঁহার কিছু ভালো লাগিতেছিল না। পরের বাড়ীতে যাহা ঘটিলে একটা মজাদার কেলেঙ্কারি মাত্র বলিয়া গণ্য হয় নিজের বাড়ীতে তাহাই ঘটিলে যে এতখানি উদ্বেগ ও মনোবেদনার উদ্ভব হইতে পারে এ ধারণাই তাঁহার ছিল না। উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে শিবচরণ একটি কলিকা ও তামাকের চোঙাটি তুলিয়া লইয়া এক ছিলিম তামাক সাজিতে বসিলেন।

এদিকে শিবচরণ বাহির হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের ঘরে বাসুর ডাক পড়িল। তাহার পর ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া মায়ে-ঝিয়ে অনেকক্ষণ কথা হইল। অবশেষে আরক্তিম চক্ষু দুইটি আঁচলে মুছিতে মুছিতে বাসু যখন দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। শিবচরণ তখনও সদর ঘরে একা বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। বাড়ীর ঝি গোবরার মাকে দিয়া গৃহিণী তাঁহাকে অন্দরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বাড়ীতে তখনও সন্ধ্যাদীপ জ্বলে নাই। বাসু কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া পুনরায় শয্যাগ্রহণ করিয়াছিল ; বাসুর মা অন্ধকার ঘরের মধ্যে একাকী বসিয়া ছিলেন। শিবচরণ ধীরপদবিক্ষেপে গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন ; গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে ?

গৃহিণী ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন,—গোপাল।

অধীর ভাবে শিবচরণ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—গোপাল? কে গোপাল? কার ছেলে?

ঝড়ু যদি সব কথা শুনিয়া আঁৎকাইয়া উঠিত, খুব খানিকটা হাউ-মাউ করিত, কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ!—বলিয়া বার কয়েক চীৎকার করিত এবং তাহার পর প্রতিজ্ঞা করিত যে ছেলেকে সে পিটাইয়া ঢিট্ করিয়া দিবে, তাহা হইলে হয়তো শিবচরণের মনের ভিতরকার দংশনোন্মুখ ভুজঙ্গটি আপাততঃ শান্ত হইয়া ফণা গুটাইয়া লইত। কিন্তু ঝড়ু দত্তের মাথায় সেদিন বোধ হয় দুষ্টগ্রহ ভর করিয়াছিল। সে একটু কঠিন ভাবে উত্তর দিল,—সে কি কথা! তাও কি কখনো হতে পারে, দাদা? গোপালের বয়স বড়জোর সতের কি আঠারো,—বাসুর চেয়ে খুব কম করে হলেও ছ'সাত বছরের ছোট। ছেলেবেলা থেকে বাসুকে দিদি দিদি করে ডেকে আসছে। এ কখনো হতে পারে না। আপনি নিশ্চয় ভুল শুনেছেন।

ঝড়ু বুঝিতে পারিল না, তাহার উত্তরটি বড় বেহিসাবী হইয়া গেল। কারণ শিবচরণ অনুভব করিলেন, তাহার কথার মধ্যে দুইটি ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ, ব্যাপারটা সৈর্বৈব মিথ্যা, অর্থাৎ শিবচরণ ভুল বুঝিয়াছেন, বাসু তাহার মায়ের কাছে মিথ্যাকথা বলিয়াছে। আর দ্বিতীয়তঃ, যদি ইহা সত্যও হয় তাহা হইলে এই ব্যভিচারের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বয়ঃকনিষ্ঠ গোপাল নহে, বয়োজ্যেষ্ঠা বাসন্তী,—শিবচরণের কন্যা। শিবচরণ আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন; মনের গোপন গুহায় রোষভুজঙ্গ আবার চাপা গর্জন শুরু করিল। তিনি অল্প কথার মানুষ; সংক্ষেপে বলিলেন,—আচ্ছা বেশ! তা—তুমি এখন যাও।

কয়েকদিন কাটিয়া গেল। শিবচরণ আঁটঘাট বাঁধিয়া ধীরে সুস্থে নিজের উদ্দেশ্য অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পাকা

খেলোয়াড় তিনি, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চাল দিতে লাগিলেন,—ঝড়ু দত্ত ক্রমশঃ মাত হইয়া আসিল। ঝড়ু নিজে কিন্তু প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিল সেই দিন যেদিন সে পুনরায় তাহার পুরাতন আর্জি লইয়া সদর নায়েব হলধরবাবুর সমীপে উপস্থিত হইল।

হলধরবাবু ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি খবর, দত্ত মশাই? কিছু দরকার আছে নাকি?

ঝড়ু দত্ত হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বলিল,—আজ্ঞে, আমার সেই ছেলেটার কথা—বসে বসে খাচ্ছে—গরীব মানুষ! সংসার তো আর চালাতে পারিনে। ওর যদি একটা কিছু—একটু আশাও তো দিয়েছিলেন আগে—

হলধরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বাধা দিয়া বলিলেন,—নাঃ! আপনার ঘ্যান-ঘ্যানানির জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলাম। কে কবে আপনাকে এরকম আশা দিল, মশাই? ওসব এখন হবে টবে না। এই সেদিন কর্তাবাবু নিজে আমাকে বলছিলেন যে আদায় তসিল খুব বেশী রকম কমে গেছে, তার ওপর আকাশের যে অবস্থা দেখছি তাতে তো মনে হয় সামনে আকাল আসছে; এ অবস্থায় খরচা পাতি একটু বুঝে সুঝে করবে।—এখন কি আর নতুন লোক বহাল করতে পারি? আর তা ছাড়া আপনার ছেলেটাও তো শুনছি একটা গাছবাঁদর হয়ে উঠেছে। অতিরিক্ত আদর দিয়ে দিয়েই বোধ হয় তার মাথাটা খাচ্ছেন!—তার চেয়ে এক কাজ করুন। ওকে মামাবাড়ী-টাড়ী কোথাও পাঠিয়ে দিন; বাইরে গেলে হয়তো দু'পয়সা রোজগারের দিকে মন যাবে। গ্রামে থাকলে ওর কিছু হবে না।

তাহার পাকা ঘুটি যে কেন কাঁচিয়া গেল তাহা বুঝিতে ঝড়ু দত্তের কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সে হলধর বাবুর অধীনস্থ সামান্য বেতনের আমলা মাত্র। শিবচরণ হলধর বাবুর অন্তরঙ্গ

বন্ধু ; দুজনে হরিহরাত্মা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঝড়ু বুঝিল শিবচরণ নেপথ্য হইতে শর-সন্ধান করিতেছেন। শঙ্কিত ভাবে সে নায়েব মহাশয়ের সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় তিনি আবার কহিলেন,—হ্যাঁ, আর একটা কথা। আজকাল আপনার খাতায় এত ভুল চুক হচ্ছে কেন, দত্ত মশাই ? একে তো হাতের লেখা আপনার বরাবরই খারাপ, পড়াই যায় না : তার পর যোগ করতে ভুল, প্রজার নাম লিখতে ভুল, দাখ্‌লের নম্বর বসাতে ভুল ! এত ভুল যদি করেন, তাহলে আপনাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে কি করে ? বাধ্য হয়েই কথাটা আমাকে কর্তাবাবুর কানে একদিন তুলতে হবে।—আচ্ছা, আপনি এখন আসুন। একটু সাবধান হয়ে কাজকর্ম করবেন।

নেপথ্য হইতেই শিবচরণ ঝড়ুকে জানাইয়া দিলেন যে তাহার মৃত্যুবাণও তাঁহার হাতে আছে, প্রয়োজন হইলে তাহাও তিনি নিক্ষেপ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। ঝড়ু দত্ত মনে মনে খুব ভীত হইয়া উঠিল। ইহার পর একদিন হাটবারে হঠাৎ তাহার সহিত পরাক্রমপুর থানার দারোগাবাবুর সাক্ষাৎ হইয়া গেল। দারোগাবাবু তাহাকে চিনিতেন ; একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন,—একটা বড়ো খারাপ কথা শুনছি, দত্তমশাই ; আপনাকে না বলে পারলাম না। আপনাদের গ্রামের দফাদার রিপোর্ট দিচ্ছে যে আপনার একটি ছেলে নাকি কুসংসর্গে পড়ে আজকাল খুব খারাপ হয়ে উঠেছে। এ তো ভালো কথা নয় ! কোনদিন কি একটা করে বসবে, আর আপনি মাঝখান থেকে ফেসে যাবেন। আগে থাকতেই সতর্ক হওয়া ভালো ; ছেলের ওপর একটু কড়া নজর রাখবেন।

নাঃ ! আর তো নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা যায় না ! শিবচরণের রোষবহ্নি কি শেষকালে তাহাকে বেড়া আগুনে পুড়াইয়া মারিবে ? দফাদারকে বলিয়া কোন লাভ নাই। সে শিবচরণের

একান্ত অনুগত লোক, নানা বাধ্য-বাধকতার সূত্রে আবদ্ধ। শিবচরণ তাহাকে যাহা করিতে বলিবেন সে তাহাই করিবে। ঝড়ু দত্ত ঠিক করিল গোপালকে সে বিদেশেই পাঠাইবে। তাহার এক পিসতুতো ভাই মহকুমা সহরে মোক্তারী করিয়া বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। গোপালকে যদি তাহার আশ্রয়ে পাঠানো যায় তাহা হইলে মন্দ হয় না। চাই কি একদিন সে কাকার মুহুরীর পদেও পাকা হইয়া বসিতে পারে। আর কালবিলম্ব না করিয়া ঝড়ু পিসতুতো ভাইকে একখানা চিঠি লিখিল। মোক্তার বাবু লোক নেহাৎ খারাপ ছিলেন না, সহজেই প্রস্তাবে রাজি হইয়া গেলেন। তাহার পর একদিন একটা ছোট পুঁটুলি হাতে করিয়া গোপাল দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে যাইতে চায় নাই, একটু কান্নাকাটিও করিয়াছিল ; ঝড়ু এক রকম জোর করিয়াই তাহাকে পাঠাইয়া দিল। শিবচরণ যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই হইল।

তাহার পর শিবচরণ নিজের মেয়েকে শায়েস্তা করিবার কাজে হাত দিলেন। খুব ছেলেবেলায় বিধবা হইয়াছিল বলিয়া বৈধব্য জীবনের সামাজিক আইনগুলি বাসুর উপর খুব কড়াকড়ি করিয়া প্রয়োগ করা হয় নাই। সে মাথায় লম্বা চুল রাখিত, চুলে তেল মাখিত, পাড়-ওয়ালা শাড়ী পরিত, দুই একটা পানও খাইত। এইবার তাহাকে থান ধুতি পরানো হইল, তাহার পান খাওয়া তেল মাখা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, তাহার মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ইহা করা হইল তাহা সফল হইল না, বরং তাহার বিপরীতটাই হইল। এতদিন বাসু মাত্র অপরূপ সুন্দরী ছিল, এইবার সে একেবারে অসাধারণ হইয়া গেল। সাধারণ নারীর ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া সে কোষ-নির্মুক্ত অসির ন্যায় ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। শিবচরণ তাহা লক্ষ্য করিলেন না। গোপালের দেশত্যাগে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত

হইয়াছিলেন; পুনরায় বিষয়-কর্মে মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে একটা মাস কাটিয়া গেল।

খুব ভোরে শয্যাত্যাগ করা বাসুর প্রতিদিনকার অভ্যাস। সেদিনও সে যখন রান্নাঘরের দাওয়ায় গোময় লেপন কার্য সমাধা করিয়া বাসি বাসন কয়খানি লইয়া মাজিতে বসিয়াছে তখন কেবল মাত্র ষ্টীমারের ভোঁ বাজিল। আরও কিছুক্ষণ পরে হাতের কাজ শেষ করিয়া সে যখন বাড়ীর উঠানে অলস ভাবে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে তখন সহসা দেখিতে পাইল ছোট্ট পুঁটুলিটি হাতে ঝুলাইয়া গোপাল চোরের মত চুপি চুপি নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। এই কয়দিনে সে যেন অনেকটা শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, চোখের কোলে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে, মাথার চুল দেখিয়া মনে হয় কত কাল তাহাতে চিরুনি পড়ে না। আর কেহ দেখিতে পাইল না, বাসুর সমগ্র মুখমণ্ডল তখন একটা অদ্ভুত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে উঠানের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। গোপাল অতিশয় বিষণ্ণভাবে মাথা হেঁট করিয়া পথ চলিতেছিল, তাহাকে দেখিতে পায় নাই। বাসু ফিস্ ফিস্ করিয়া ডাকিল,—এ কি! গোপাল বাবু যে!

গোপাল হঠাৎ থমকাইয়া থামিয়া গেল। যেন একটা নিতান্ত শারীরিক বেদনার বিদ্যুৎ-স্পর্শে তাহার সমগ্র দেহ ঝাঁকুনি দিয়া উঠিল। যখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল তখন একটা প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে তাহার কালো মুখ আরও কালো হইয়া উঠিয়াছে! বাসুর নূতন মূর্তির দিকে নির্বোধের ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাসুর দুই চোখে কৌতুকের আলো নাচিতেছিল। অবর্ণনীয় আত্মতৃপ্তির সহিত মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—থাকতে পারলে না বুঝি? বাসুদিকে ছেড়ে থাকতে পারলে না?

গোপাল কোন কথা কহিল না। বাসুর মুখের দিকে চাহিয়া

স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরে ধীরে দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার মলিন গণ্ডের উপর গড়াইয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার চমক ভাঙিয়া গেল ; তাড়াতাড়ি কোঁচার কাপড়ে দুই চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া দ্রুত পদক্ষেপে নিজের বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। বাসু সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখে তখনো সেই হাসি।

দু'জনের কেহই দেখিতে পাইল না যে তাহাদের এই সাক্ষাৎকারের একজন সাক্ষী রহিয়া গেল। সেদিন কোন কারণে খুব ভোরে ঝড়ু দত্তের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল ; সে শয়নঘরের জানালা দিয়া সব দেখিতে পাইল। বাসুর মুখের হাসিটুকু পর্যন্ত তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই।—তাহা হইলে তো সত্যই সর্বনাশ হইয়াছে! রাক্ষসী তো সত্যই তাহার ছেলের মাথাটি চিবাইয়া খাইয়াছে ! এখন কি করা যায়? ছেলেটার তো যাহা হইবার হইয়াই গিয়াছে ; এখন শিবচরণের কুটিল ক্রোধের উদ্যত খড়্গ হইতে কি উপায়ে আত্মরক্ষা করা যায়? ভাবিতে ভাবিতে ঝড়ুর মাথা গরম হইয়া উঠিল।

ছেলের শরীরের অবস্থা দেখিয়া ঝড়ু প্রথম দিনটা তাহাকে কিছু বলিল না। কিন্তু মনস্তাপ এইরূপ ভাবে চাপিয়া রাখার ফলে তাহার তীব্রতা অনেকখানি বাড়িয়া গেল। পরদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর যখন সে গোপালকে ডাকিয়া পাঠাইল তখন ক্রোধে ও দুশ্চিন্তায় তাহার মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছিল। তবু কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চলে এলি কেন?

—ওরা আমাকে খেতে দেয় না।

—ওঃ! কি আমার লবাব-পুত্তুর রে! বাড়ীতে কি এমন পোলাও কালিয়া খেতে পাস্ যে পরের ঘরের ভাত মুখে রোচে না?

—আমি কি পোলাও কালিয়া খেতে চেয়েছি? ওরা যে ডালভাতও পেট ভরে আমাকে খেতে দেয় না!

ঝড়ু দত্ত এইবার একেবারে ফাটিয়া পড়িল ; চীৎকার করিয়া

বলিল,—তবে রে হারামজাদা! বাপের মুখের ওপর মুখ নেড়ে খুব তক্কো করতে শিখেচিস্, না? উদয়াস্ত খেটে খেটে আমি ভাত যোগাড় করবো, আর তুই জোয়ান ছেলে হাত পা কোলে করে বসে বসে সেই ভাত খাবি! তোর লজ্জা করে না? তোকে আবার সেখানে যেতে হবে।

ঘাড় হেঁট করিয়া গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া গোপাল জবাব দিল,—আমি যাবো না।

—তুই যাবি নে তোর বাবা যাবে।

—আমি মরে গেলেও আর সেখানে যাবো না।

—আচ্ছা, আমিও দেখে নিচ্ছি তুই যাস্ কি না।

ঝড়ু ক্রোধে গজরাইতে গজরাইতে উঠিয়া গেল। স্থির করিল সে নিজে সঙ্গে করিয়া ছেলেকে আবার সহরে রাখিয়া আসিবে। কিন্তু তাহা আর করিতে হইল না। পরদিনই মোক্তার ভাই-এর নিকট হইতে একখানি পোষ্টকার্ড আসিয়া পৌঁছিল। তিনি লিখিয়াছেন যে গোপাল কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে পলাইয়া আসিয়াছে, বাজার খরচের পয়সা চুরি করিয়া ষ্টীমার ভাড়া সংগ্রহ করিয়াছে। এমতাবস্থায় দাদা যেন তাহাকে আর সেখানে না পাঠান,—কারণ ভাত কাপড় দিয়া নিজের ঘরে চোর পুষিবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ নাই।

ঝড়ু দত্তের মনে হইল যেন তাহার পায়ের নীচে হইতে মাটি সরিয়া যাইতেছে। এখন উপায়? ছেলে তো চোর অপবাদ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল! ডাকিনীও যে তাহার স্কন্ধে বেশ ভালো করিয়াই 'ভর' করিয়াছে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। নিজের চক্ষুকে তো আর অবিশ্বাস করা যায় না! এখন শিবচরণের ক্রূর চক্রান্ত হইতে সে কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিবে? উঃ! কি ছেলেই তাহার জন্মিয়াছে! একেবারে মুষলং কুলনাশনং!

ক্রোধান্ধ ঝড়ু এবার আর বৃথা বাক্যব্যয় করিল না। পায়ের

খড়ম হাতে তুলিয়া ছেলেকে নির্মমভাবে আক্রমণ করিল। গোপালের নাক মুখ মাথা ফাটিয়া রক্তারক্তি হইয়া গেল ; পিঠের উপর বড় বড় কালশিরা দাগড়া দাগড়া হইয়া ফুটিয়া উঠিল ; একটা চোখ ফুলিয়া বন্ধ হইয়া গেল। তবু প্রহারের বিরাম নাই ? গোপাল দুই একবার বাবারে ! মারে ! করিয়া চীৎকার করিয়াছিল ; তাহার পর একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মার খাইতে লাগিল। তাহার পর যখন সে অবসন্ন মূর্ছিতপ্রায় হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে তখন ঝড়ুর স্ত্রীর মড়াকান্নায় আকৃষ্ট হইয়া পাড়ার লোকজন ছুটিয়া আসিল। তাহারা ধরিয়া না ফেলিলে ঝড়ু বোধ হয় সেদিন ছেলেকে খুনই করিয়া ফেলিত। প্রতিবেশীরা কিন্তু এই অমানুষিক প্রহারের আসল কারণটি তখন জানিতে পারিল না। তাহারা ভাবিল বোধ হয় মোক্তার কাকার টাকা চুরি করিয়া বাড়ী পলাইয়া আসার অপরাধেই গোপাল পিতৃহস্তে এরূপ নির্যাতিত হইল।

পরদিন সকালে সকলে শুনিল গোপাল নিরুদ্দেশ হইয়াছে। গ্রামের ছেলে এইরূপ কারণে মাঝে মাঝে গৃহত্যাগ করিয়া থাকে, সুতরাং কেহ বড় একটা গা করিল না। তবে যাইবার সময় গোপাল একেবারে রিক্তহস্তে চলিয়া গিয়াছে, একখানি গামছা পর্যন্ত সঙ্গে লইয়া যায় নাই—একথা শুনিয়া সকলে একটু বিস্ময় অনুভব করিল এইমাত্র।

চারদিন পরে গোপালকে পাওয়া গেল। বাড়ী হইতে অনেকটা দূরে নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড গাব গাছের উঁচু ডাল হইতে কণ্ঠলগ্ন গরুর দড়ি অবলম্বন করিয়া সে ঝুলিতেছিল। জেলে-বাড়ীর দুইটি ছোট ছেলে পাকা গাবের লোভে গাছে উঠিয়াছিল। তাহারাই দেখিতে পায়। কাকে চোখ দুইটি খুবলাইয়া লইয়া গিয়াছে ; বৃক্ষ-বিহারী পিপীলিকার দল সর্বাঙ্গে ছিদ্র করিয়া

দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে : পচিয়া ফুলিয়া গোপাল ঢোল হইয়া উঠিয়াছে।

ঝড়ু দত্তের বাড়ীতে বুকফাটা কান্নার রোল পড়িয়া গেল। দুঃখ ও সহানুভূতির অভিঘাতে গ্রামজীবনের নিস্তরঙ্গ প্রবাহ প্রবল-ভাবে মন্থিত ও আলোড়িত হইয়া উঠিল। শিবচরণের প্রতিহিংসা যে এরূপ মর্মান্তিক ভাবে চরিতার্থ হইবে তাহা শিবচরণ নিজেও কখনো কল্পনা করেন নাই ; এরূপ নিদারুণ সম্ভাবনার কথা তিনি ভুলিয়াও ভাবেন নাই। তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া ঝড়ুর বাড়ীতে ছুটিয়া গেলেন এবং অচৈতন্যপ্রায় ঝড়ুকে নিজের বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন। আর কাঁদিল বাসু। রুদ্ধদ্বার কক্ষের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া মনের সাধ মিটাইয়া কাঁদিল।

তাহার পর আবাব দিন চলিতে লাগিল। ঝড়ু নিত্য নিয়মিত ভাবে কাছারি গিয়া খাতা লিখিতে লাগিল। শিবচরণ বিষয়কর্মে মনোনিবেশ করিলেন। কালের অমৃতহস্ত-প্রলেপে ধীরে ধীরে ক্ষত শুকাইয়া আসিতে লাগিল।

পুত্রহন্তাকে কি কেহ ক্ষমা করিতে পারে? বোধ হয় পারে না। ঝড়ুও নিশ্চয় শিবচরণকে ক্ষমা করিতে পারে নাই। কিন্তু পূর্বে তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল পরেও তাহা হইতে বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। তাহারা পূর্বের ন্যায় পবস্পরেব নিকটতম প্রতিবেশী হইয়াই রহিল। নিজস্ব ফাই ফরমাশ খাটাইবার প্রয়োজন পড়িলে শিবচরন-গৃহিণী পূর্বেরই ন্যায় ঝড়ু ঠাকুরপোর নিকট ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন; বৈষয়িক বিপদ-আপদে পরামর্শ লইবার জন্য ঝড়ুও পূর্বেরই ন্যায় শিবচরণ দাদার শরণাপন্ন হইতে লাগিল। অন্ততঃ জীবনের বহিরঙ্গের দিক দিয়া বিচাব করিলে গোপাল সর্বতোভাবে পরাজিত হইয়া গেল।

আমার কাহিনী শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু ঠিক যে রসটি ফুটাইতে চাহিয়াছিলাম বেশ বুঝিতে পারিতেছি অক্ষম হস্তের অপটু লেখনী তাহা ফুটাইতে পারে নাই। ইচ্ছা ছিল ঘটনার অন্তরালে অবস্থিত কয়েকটি মনের রহস্য একটু ঘটা করিয়া প্রকাশ করিব। কিন্তু গল্প বলিবার নেশা যাহাকে পাইয়া বসিয়াছে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ তাহার পক্ষে সহজসাধ্য নহে। সুতরাং যাহা হইবার নহে তাহার জন্য আফ্‌শোষ না করিয়া কাহিনীব শেষ দৃশ্যটির অবতারণা করা যাউক।

শীতকালের দ্বিপ্রহর। রাখাল আসিয়া সংবাদ দিল, কানাই মণ্ডলের মটর ক্ষেতের কচি শুঁটিগুলি এবার একটু বিশেষ ধরণের মিষ্টতা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। রাখাল হাজু স্যাকরার ছোট ছেলে, আমার প্রিয়তম সাকরেদ। তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে। সুতরাং দুইজনে বাহির হইয়া পড়িলাম। কানাই মণ্ডলের ক্ষেত পাড়ার খুব নিকটেই অবস্থিত, একেবারে সংলগ্ন বলিলেও চলে। কচি কচি ডগা ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া নীলাভ সবুজ রঙের মটর গাছগুলি এক বুক সমান উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষেত্রজ ওষধি যেন অরণ্যানীর শোভা ধারণ করিয়াছে। দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। কিন্তু আমরা নয়নের পরিতৃপ্তির সন্ধানে সেখানে আসি নাই। পরিপুষ্ট মটরশুঁটিগুলির নধর তারুণ্য আমাদের রসনা রসার্দ্র করিয়া তুলিতেছিল। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া ক্ষেত্রেব প্রান্তে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া পড়িয়া স্বকর্মে মনোনিবেশ করিলাম।

এতটা লুকোচুরির বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কানাই মণ্ডল সম্পন্ন চাষী গৃহস্থ। দুইটি বালকের এই চৌর্যবৃত্তি তাহার নজরে পড়িলেও সে বিশেষ বিচলিত হইত না। প্রহার বা তিরস্কার লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু যেমন ঝাল মশলার সংযোগ না থাকিলে কাঁচা আম বা কুল খাইযা তেমন মজা হয় না,

তেমনি কিঞ্চিৎপরিমাণে অপরাধবোধের সংমিশ্রণ না থাকিলে বাল্যকালের স্বাধীন ভোজন তেমন সুস্বাদু বলিয়া মনে হয় না। চুরি করিয়া খাইবার মত মজা আর কিছুতেই নাই। কাজেই ধরা পড়িলেও যেখানে কিছুই হইবে না জানি, সেখানেও আমরা ধরা না পড়িবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া একটু অতিরিক্ত আনন্দ আহরণ করিয়া লইতাম।

হঠাৎ মনে হইল আমাদের সম্মুখে প্রায় দশ বার হাত দূরে ক্ষেতের মধ্যে কি যেন অল্প অল্প নড়িতেছে। কনুইএর গুঁতা দিয়া রাখালের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম। সে একবার চাহিয়া লইয়া মৃদুস্বরে বলিল,—লাফারু টাফারু হবে বোধ হয়!—বলিয়াই পুনরায় শুঁটির সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। লাফারু এক প্রকার বড় জাতের খরগোস। আমাদেরই মত মটরশুঁটি খাইতে খুব ভালোবাসে; মটর শাকের প্রতিও বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে। কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। রাখালের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে বিশ্ব-সংসারের আর সমস্ত কিছু ভুলিয়া মটরশুঁটির রসাস্বাদনে মশ্‌গুল হইয়া আছে। তাহাকে আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে দুই হাতে মটরগাছ সরাইয়া হামাগুড়ি দিয়া ভিতরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। চুরি করিয়া খাইবার অভ্যাস থাকার দরুণ নিঃশব্দ-সঞ্চরণেও বেশ অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। শ্বাস প্রশ্বাস প্রায় নিরুদ্ধ করিয়া অতি সন্তর্পণে মাথা হেঁট করিয়া আগাইয়া চলিলাম। স্থানটির খুব কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে মাথা তুলিয়া উঁকি মারিয়া চাহিলাম। দেখিলাম, লাফারু নহে, মানুষ।

মটর ক্ষেতের মধ্যে খানিকটা বৃত্তাকার উন্মুক্ত স্থান। সেখানকার মটর গাছগুলিকে পা দিয়া মাড়াইয়া কিংবা হাত দিয়া চাপিয়া মাটিতে পাড়িয়া ফেলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আছে হরিনাথ চাটুজ্জের সেজছেলে শম্ভু,—আমাদের শম্ভুদা; আর তাহার কোলে মাথা

রাখিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছে বিস্রস্তবসনা বাসু। বাসুর বুকের কাপড় খসিয়া পড়িয়াছে; তাহার অনাবৃত সুগৌর যৌবন-লাবণ্যের উপর আকাশ হইতে শীতের রৌদ্র ঝরিয়া পড়িয়া যেন একটা সোনালি প্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছে। তাহার দুই চক্ষু অর্ধ-স্তিমিত, মুখে একটা অনির্বচনীয় মৃদু হাসির অস্পষ্ট আভাস। শম্ভুদাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন পাথরের মূর্তি। দুটি হাত দিয়া আলগাভাবে বাসুর মাথাটি ধরিয়া আছে; দুই চক্ষুর উদ্‌ভ্রান্ত অথচ তীব্র দৃষ্টি বাসুর মুখের উপর নিবদ্ধ। দু'জনেই নির্বাক্, নিস্তব্ধ।

অকারণেই মনের মধ্যে কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। যেমন নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়াছিলাম, তেমনি ভাবেই ধীরে ধীরে পিছু হটিয়া চলিয়া আসিলাম। রাখালকে পর্যন্ত এ সম্বন্ধে একটি কথাও বলিতে পারিলাম না।

শম্ভুদার বয়স তখন মাত্র পনের কি ষোল।

অতি শৈশব কাল হইতেই আনন্দ মণ্ডলের আওতায় পড়িয়াছিলাম। কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবার বয়স অবশ্য তখনো আমার হয় নাই। কিন্তু স্বীকারের প্রয়োজনও ছিল না, কারণ আনন্দ মণ্ডল আমার নিকট হইতে এরূপ কোন স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে নাই। সে নিজ হইতেই আমার গুরুর আসনে জাঁকিয়া বসিয়াছিল। প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে গান গল্প প্রভৃতি নানারূপ মনোহারী মোড়কে মুড়িয়া বহু প্রকার অমূল্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশ আমাকে সে সেবন করাইত। কতক বুঝিয়া কতক না বুঝিয়া আমিও সেগুলি অকাতরে গলাধঃকরণ করিতাম। ফলে সেই কাঁচা বয়সেই আমি বেশ খানিকটা পাকিয়া উঠিয়াছিলাম,—ধর্মবুদ্ধি আমার বেশ টন্‌টনে হইয়া উঠিয়াছিল। মনে আছে একবার শিরোমণি মহাশয়ের কি একটা প্রশ্নের উত্তরে আমি গম্ভীর ভাবে বলিয়াছিলাম যে ঈশ্বর 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'। ছোটমুখে বড়কথা শুনিয়া শিরোমণি মহাশয় হা-হা করিয়া খুব হাসিয়াছিলেন।

আজ আমিও বড় হইয়াছি, অনেক বড় বড় কথা বলিতে শিখিয়াছি। আজ জীবনযাত্রার মধ্য হইতে ধর্মবুদ্ধিকে সযত্নে পরিহার করিতে শিখিয়াছি, 'ধার্মিক' এই আখ্যাটিকে নিন্দার সামিল বলিয়া বিবেচনা করিতে শিখিয়াছি। আনন্দ মণ্ডল যাহা এত যত্ন করিয়া শিখাইয়াছিল, ততোধিক যত্নপূর্বক তাহা ভুলিবার সাধনা করিয়াছি। কিন্তু ঈশ্বর আছেন—এই সংস্কারটুকু কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিলাম না। চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। নিরীশ্বরবাদের মহিমা কীর্তন করিয়া শেলী হইতে রাসেল পর্যন্ত যে যেখানে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন সমস্ত সযত্নে অধ্যয়ন করিয়াছি।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ লইয়া বহু গবেষণা করিয়াছি। আভোগাড্রোর প্রকল্প হইতে আনবিক বোমা পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করিয়া চমৎকৃত হইয়াছ। মানুষের মন কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—আর্থিক পরিবেশের দ্বারা না যৌন অনুভূতি ও অনুধ্যানের দ্বারা,—এই সন্দেহের দোলায় অনেক দুলিয়াছি। গদ্য কবিতার ছন্দ, ভাষা ও ভাব লইয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি। অর্থ-নীতিতে এম্-এ পাশ করিয়াছি, কালো বাজারে ব্যবসায় করিয়া অর্থোপার্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছি, ছোটখাটো ইলেক্‌শনে পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু ঈশ্বরবাদের ভূত আমার ঘাড় হইতে কিছুতেই নামিল না; খাঁটি আধুনিক আমি কিছুতেই হইতে পারিলাম না—পঁচিশ বৎসর বয়সেও না, পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও না। আনন্দ মণ্ডল আমার মাথা খাইয়া দিয়াছে।

ধান ভানিতে শিবের গীত শুরু করিয়াছি। এখন আসল কথায় ফিরিয়া আসা যাউক। অকালে অতিরিক্ত মাত্রায় ধর্মপ্রবণ হইয়া উঠিবার ফলে আমার আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক কোন লাভ হইয়াছিল কি না জানি না। কিন্তু প্রাকৃত জীবনে ইহার ফল হইল এই যে আমি কীর্তন ও কথকতার সবিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠিলাম। বিশেষ করিয়া কীর্তনের। কীর্তন শুনিবার সুযোগও জুটিত প্রচুর। শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে বাহির হইতে নামজাদা কীর্তনীয়াদের 'বায়না' করিয়া লইয়া আসা তো হইতই, তাহা ছাড়া খাস গ্রামেই তিনটি কীর্তনের দল ছিল,—রামধন গোঁসাই-এর দল, সোপাড়ার দল ও নমশূদ্র পাড়ার দল। স্থানীয় দলগুলি কীর্তন গাহিয়া কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিত না; কাজেই কারণে অকারণে ঘন ঘন আসর বসাইয়া নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগের অভাব তাহাদের হইত না। আর আসর যেখানেই বসুক না কেন, শ্রোতা হিসাবে আমার সেখানে উপস্থিতি ছিল অনিবার্য। কীর্তন শুনিতে শুনিতে

উঠিয়া গিয়াছি এরূপ কখনো মনে পড়ে না। নিতান্ত অধিক রাত্রি হইয়া গেলে হয়তো জাগিয়া থাকিতে পারি নাই, আসরের এক প্রান্তে পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইয়াছি,—কিন্তু আসর ভাঙিবার পূর্বে কখনো ঘরে ফিরি নাই।

গ্রামের চতুর্থ কীর্তনের দলটি গড়িয়া উঠিল সর্দার পাড়ায়। দেবনাথ সর্দার সুকণ্ঠ গায়ক হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। 'মূলগায়েন' রূপে তাহাকেই অবলম্বন করিয়া দলটির সৃষ্টি হইল। বলাই সর্দার ও রঙ্গু সর্দার খোল বাজাইবার ভার পাইল। প্রথম আসর বসিল শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ীতে।

সে দিনের কথা আমার এখনো বেশ মনে আছে। গ্রীষ্মকালের রাত্রি। খোলা আঙিনায় চাঁদোয়া টানাইয়া ও মাদুর সতরঞ্চ বিছাইয়া আসর করা হইয়াছে। আসরের চারি কোণায় চারিটি গ্যাসের আলো; মধ্যস্থলে চাঁদোয়ার বাঁশ হইতে প্রকাণ্ড একটি ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলিতেছে। বাড়ীতে কীর্তন দিতে হইলে গৃহস্থের একমাত্র খরচা ছিল এই আলোর আয়োজন। নিজেদের পান-তামাকের সরঞ্জাম পর্যন্ত গায়কেরা নিজেরাই সঙ্গে করিয়া আনিত। শ্রোতার ভিড় বেশ ভালোই হইয়াছিল, কারণ শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইলে গ্রামের কেহই সে নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিত না,—নিমন্ত্রণের উপলক্ষ যাহাই হউক না কেন। মণ্ডপঘর ও বৈঠকখানার বারান্দায় রঙীন চিকের আড়ালে দল বাঁধিয়া বসিয়াছিল গ্রামের মেয়েরা। দৈনন্দিন জীবনে কোন সময়ে কোন ক্ষেত্রেই পর্দা প্রথার অস্তিত্ব আমরা বড় একটা অনুভব করিতে পারিতাম না; কিন্তু কোনরূপ উৎসব সমাবেশ হইলেই চিক নামধেয় এই বস্তুটির রহস্যজনক আবির্ভাব এই যাবনিক প্রথার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিত। রহস্যজনক বলিলাম এই জন্য যে যৌক্তিকতার দিক হইতে চিকের আবশ্যকতা যে কি তাহা আমরা কোনদিনই বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু একথা সকলেই মানিয়া লইয়াছিলাম যে, কোন

কারণে একদল মেয়ে কোথাও একত্র জড়ো হইয়া বসিলে তাহাদের সম্মুখে চিক না থাকাটা বড়ই নিন্দার কথা।

কীর্তন সেদিন খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করিল যে এমন গান গ্রামে বহুদিন শোনা যায় নাই। বিশেষতঃ মূলগায়েনের প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। গোঁসাই ঠাকুর বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন ; দেবনাথের মত কীর্তনের গলা এখন নাকি আর গ্রামে কাহারও নাই।

সেদিনকার দেবনাথ সর্দারকে যে দেখে নাই পুরুষ মানুষের সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাহার মনের মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ আদর্শ গড়িয়া উঠা সম্ভব বলিয়া আমার কিছুতেই মনে হয় না। আজকালকার 'জিমনেসিয়ামের' সৃষ্টি 'মাস্‌ল'-সর্বস্ব জীবগুলিকে আমি বহুবার দেখিয়াছি। বাহু স্কন্ধ ও বক্ষের মাংসপেশীগুলিকে আপ্রাণ সাধনার দ্বারা তোষণ ও পরিপোষণ করিয়া তুলার আঙুরের মত সেগুলিকে সযত্নে জীয়াইয়া রাখা এবং সুযোগ পাইলেই রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া সেগুলিকে নাচাইয়া দর্শকদের বাহবা লওয়াই ইহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া মনে হয়। পেশী ফীত হইতে হইতে বিশ্রী ঢিবির মত হইয়া উঠিয়াছে ; ওদিকে কোলকুঁজা শরীর বাঁকিয়া ধনুকের মত হইয়া গিয়াছে, মুখ চড়াইয়া গিয়াছে, মাথায় অকালে টাক পড়িয়া গিয়াছে, নিষ্প্রভ চক্ষু কোটরে বসিয়া গিয়াছে। ইহাদের শরীরে কোথাও স্বাভাবিকতা নাই, কাজেই সৌন্দর্য আসিবে কোথা হইতে? সত্যকার দেহ সৌন্দর্য সম্বন্ধে ইহাদের কোন ধারণাই নাই। এরূপ শরীর লইয়া যাহারা গৌরব করিয়া বেড়াইতে পারে, তাহাদিগকে দেবনাথের অপরূপ সৌন্দর্যের কথা বুঝাইয়া বলিব কি উপায়ে?

দেবনাথের রঙ ছিল কুচকুচে কালো, এমন কালো যে তাহার কাছে কষ্টিপাথরও হার মানিয়া যায়। কিন্তু দেবনাথের এই কালো

রঙের উপর সর্বদা এমন একটা চিক্কণ লাবণ্যের দীপ্তি খেলিয়া বেড়াইত যে 'কালোর আলো' কথাটিকে সে সত্যই সার্থক করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া মনে হইত। লাবণ্য ছিল, কিন্তু তাহার শরীরের কুত্রাপি বিন্দুমাত্র মেয়েলিপনার ছোঁয়াচ লাগে নাই। ঋজু সুঠাম নাতিদীর্ঘ শরীরের সর্বাঙ্গে পরিপুষ্ট অথচ প্রচ্ছন্ন মাংসপেশীগুলি পোষা সাপের মত পাকে পাকে জড়াইয়া রহিয়াছে, সরল উন্নত নাসার দুই পার্শ্বে নির্মল চক্ষু দুইটি প্রসন্নতার আলোকে প্রদীপ্ত, মাথায় একমাথা বাবরি চুল, গলায় ত্রিকণ্ঠি তুলসীর মালা, মুখে শান্ত হাসি—দেবনাথকে যেন আজিও আমি চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। সহজ শক্তি ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যই ছিল তাহার সৌন্দর্যের উৎস। সে মাঠে সারাদিন লাঙল চালাইবার পর সন্ধ্যার সময় একাদিক্রমে তিনঘণ্টা লাঠি খেলিতে পারিত; একদিনে একটা আস্ত আমগাছ কাটিয়া ফাড়িয়া চেলা করিয়া ঘরে তুলিয়া দিতে পারিত; একটানা বিশ ক্রোশ পথ হাঁটিতে পারিত; আড়াই সের চিঁড়া ও এক হাঁড়ি দই উড়াইয়া 'জলপানের' নিমন্ত্রণ রক্ষা করিত। গলায় শিরোমণি মহাশয়ের 'আশীর্বাদী' বেলফুলের মালা পরিয়া, পরিধানের খাটো ধুতির কোমরে একখানি পুরাতন নামাবলী জড়াইয়া বাধিয়া, এই দেবনাথ সেদিন যখন তাহার সতেজ সুমিষ্ট কণ্ঠে কীর্তন ধরিল, তখন অতি পরিচিত লোকটির এই অপ্রত্যাশিত গুণের পরিচয় পাইয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বার বার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

দেবনাথ গৌরচন্দ্রিকা গাহিতেছিল,—

গৌর হে——, হে গৌরাং,
ও——গৌর-সুন্দর হে!

এই সংকীর্তনের সভায় তোমায় 'এসতে' হবে।.........

সাধু ভাষায় আবাহন না করিলে কোন দেবতাই সাড়া দেন না, দেবনাথের ইহাই ছিল বিশ্বাস। তাই 'বাবু-মশাই'-দের মুখের কথা

অনুকরণ করিবার প্রবল প্রচেষ্টায় সে এই 'এসতে' কথাটি সৃষ্টি করিয়াছিল। শ্রোতাদের মধ্যে যাঁহারা অল্পাধিক শিক্ষিত ছিলেন তাঁহাদের মনে অবশ্য কথাটি একটু হাস্যরসেরই সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু স্বয়ং গৌরসুন্দর যে হাসেন নাই একথা আমি হলফ্ করিয়া বলিতে পারি। কারণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম আবাহনের আকুল আবেগে দেবনাথের দেহ ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, ভাবাশ্রু-সঞ্চারে তাহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিতেছে। দেবতা যে মুখের কথা অপেক্ষা মনের ভাবকে বেশী মূল্যবান মনে করেন, সেকথা আমি সেই শিশুকালেই জানিতাম—আনন্দ মণ্ডলেব গুরুগিরির কল্যাণে।

দেবনাথ সর্দার ছিল গ্রামের একজন নাম-করা 'ভক্ত'। ভক্তিব পাত্র-পাত্রী বিচারে তাহার কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। কীর্তনেই আসরে হরিগুণ গাহিতে গাহিতে সে যেমন ভাব-বিহ্বল হইয়া পড়িত, দুর্গা-মণ্ডপের সম্মুখে বসিয়া শ্যামা-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে মা-মা করিয়া কাঁদিয়া তেমনি আকুল হইয়া উঠিত। আবাব গাজনতলায় সন্ন্যাসীদেব সহিত বসিয়া ছিলিমের পর ছিলিম গাঁজা পুড়াইতে পুড়াইতে সে যখন হর-হর-ব্যোম্!—বলিয়া প্রচণ্ড হাঁক ছাড়িয়া উঠিত, তখনো তাহার ভক্তির অকপটতা সম্বন্ধে সন্দেহেব বিন্দুমাত্র অবকাশ কাহারও থাকিত না। তাহা ছাড়া 'গু ড়ি কাষ্ঠ নুড়ি শিলা' যেখানে যত দেব দেবী আছে, তাহাদের সকলেরই প্রতি তাহার হৃদয়ের ভক্তিস্রোত সমান প্রাবল্যের সহিত প্রবাহিত হইত। ব্রাহ্মণ মাত্রই তাহার নিকট ছিল দেবতা। ব্রাহ্মণ সন্দর্শন ঘটিলেই সে এরূপ অতিরিক্ত মাত্রায় ভক্তি-গদ্‌গদ হইয়া পড়িত যে, অসাধু সন্দেহ-সঙ্কুল যুগের লোকের পক্ষে তাহাকে শ্রেণীবিশেবের লক্ষণ স্বরূপ অতিভক্তি' ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া মনে করা সম্ভব হইত না। কিন্তু সেকালের পাড়াগাঁয়ে ভক্ত মানুষের পক্ষে এরূপ

আচরণ স্বাভাবিক বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইত। বস্তুতঃ ভক্তিই ছিল দেবনাথের মানসিক গঠনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। ধর্ম জিনিসটা সে বিশেষ বুঝিত বলিয়া মনে হয় না। আচার যদি বা কিছু কিছু বুঝিত, তত্ত্ব একেবারেই বুঝিত না। আমার ন্যায় বালখিল্যের মুখে ধার করা তত্ত্বকথার বুলি শুনিয়াই বিস্ময়ে তাহার চক্ষু বড় বড় হইয়া উঠিত সে আমাকে প্রায়ই বলিত,—উ-রে বাস্‌। দাদা-ঠাকুর, এই বয়সে এত কথা তুমি শিখলে ক্যামন করে? বেঁচে থাকলি তুমি একটা ক্ষ্যানজম্মা মান্নুষ হবা,—দেখে নিও, এই বলে রাখলাম আমি।

গ্রামের সকলেই ভাবিত তাহারা এই সুদর্শন সদানন্দ সরল-প্রাণ মান্নুষটিকে ভালো করিয়াই চেনে। আমিও প্রথমে তাহাই ভাবিতাম। কিন্তু একদিন আমার সেই ভুল ভাঙিয়া গেল। একদিন আমি সহসা বুঝিতে পারিলাম, আমাদের এই চেনা মান্নুষটির মনের ভিতর এক নূতন দেবনাথ লুকাইয়া আছে। সেই গহনচারী মান্নুষটি আমাদের একান্ত অপরিচিত; চিরকাল আমাদের মধ্যে বাস করিয়াও সে বিদেশী! ধানসোনার নদী ও ক্ষেতের ফাঁদে তাহার জীবনটি মাত্র বন্দী হইয়া আছে; মন তাহার প্রবাসী বিহঙ্গের ন্যায় কোন্‌ সুদূর নীড়ের সন্ধানে আজিও মাঝে মাঝে পাখা মেলিয়া উড়িয়া যায়।

সর্দারদের অনুপস্থিতিতে গ্রামের লোক তাহাদেব 'বুনো' বলিয়াই উল্লেখ করিত। একটা বন্য স্বতন্ত্র সংস্কৃতির চিহ্নও কিছু কিছু তাহাদের মধ্যে ছিল। লোকে বলিত তাহারা সাঁওতাল; প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে মন্বন্তরে জনহীন দেশের পতিত জমিতে সোনা ফলাইয়া দেশের লোকের মুখে অন্ন যোগাইবাব জন্য তাহাদিগকে নাকি বাংলার বাহির হইতে লইয়া আসা হইয়াছিল। তাহার পর গ্রামের সমাজ ধীরে ধীরে তাহাদিগকে আপন করিয়া লইয়াছে। কিন্তু আজ মনে সন্দেহ জাগে, বোধ হয় তাহারা সম্পূর্ণরূপে আপন হয় নাই।

গ্রামের দক্ষিণদিক দিয়া জেলাবোর্ডের যে রাস্তাটি বাজার হইতে বড়গাঙের খেয়াঘাটের দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে অনেকগুলি ছোটবড় পর্ণকুটির লইয়া সর্দার পাড়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সর্দারেরা সকলেই চাষী ; কিন্তু গ্রামের অন্যান্য চাষীদের ন্যায় ইহারা অবসর সময়টুকু আলস্যে কাটাইত না। পুরুষেরা গাছ কাটিত, কাঠ ফাড়িত, ঘরামিগিরি করিত ; মেয়েরা মাটি কাটিত এবং প্রয়োজন হইলে চাষের কাজে সাহায্য করিত। দরিদ্রের মত বাস করিত বটে কিন্তু সত্য সত্য দরিদ্র ইহাদের কেহই ছিল না।

আমাদেরই গ্রামের লোক ছিল ইহারা, কিন্তু ইহাদের জীবন-যাত্রার মধ্যে কোথায় যেন একটু গোপনতার আভাস পাইতাম ;—কেমন একটা রহস্যময় আত্মসম্পূর্ণ ভাব ! সবটুকু প্রকাশ করিয়াও কোথায় যেন কি একটু লুকাইয়া রাখিয়াছে ! যেদিন রাত্রে জ্যোৎস্না উঠিত, সমস্ত গ্রাম নিশ্চিন্ত আরামে হাত-পা ছড়াইয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে স্বপ্ন দেখিত, আর আমাদের শিশুমন হালকা মেঘে ভর করিয়া রূপকথার রাজ্যে উড়িয়া যাইতে চাহিত, সেদিন একটু বেশী রাত্রে প্রায়ই সর্দার পাড়া হইতে মাদলের ধ্বনি শুনা যাইত। সুদূর অতীতে যেদিন এই সর্দারদের পূর্বপুরুষেরা বনভূমির মায়া কাটাইয়া মধ্যবঙ্গের শস্যক্ষেত্রের অভিমুখে যাত্রা শুরু করিয়াছিল, সেদিন তাহাদের হাতে বাঁশী ছিল আর কাঁধে ছিল মাদল। দীর্ঘ পথের কোন্ নাম-না-জানা বাঁকে তাহাদের হাতের বাঁশী খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু কাঁধের মাদল তাহারা কাঁধে করিয়াই লইয়া আসিয়াছিল। সর্দার পাড়া হইতে কোনদিন বাঁশীর সুর শুনিতে পাই নাই, কিন্তু মাদলের ধ্বনি প্রায়ই শুনিতাম। ঢাকের বাজনা, ঢোলের বাজনা, খোলের বাজনা—এ সবের মধ্যে আমি একটা স্বকীয়তার আস্বাদ ও আশ্বাস পাইতাম। আমারই দেশ বা আমারই সমাজের এক একটি বিশিষ্ট রসরূপ ইহাদের মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিত। কিন্তু মাদলের বাজনা শুনিলেই আমার বুকের

ভিতর কেমন যেন করিয়া উঠিত ; মনে হইত যেন পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যাইতেছে, যেন আমি আমার সমস্ত পরিচিত পারিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হালকা হর্ষের বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। কোন কোনদিন রাত্রে অনেক মাদল একসঙ্গে বাজিতে আরম্ভ করিত, আর মাদলের রোলের সহিত অস্পষ্ট করুণ দীর্ঘায়িত সুরের রেশ ভাসিয়া আসিত। মা বলিতেন,—বুনোর পাল মদ গিলে নাচতে শুরু করেছে। সারারাত জ্বালিয়ে মারবে।

যেদিন সর্দার পাড়ায় এইরূপ সারারাত্রিব্যাপী উৎসব চলিত তাহার পরদিন গ্রামে 'কিষাণ' দুর্লভ হইয়া উঠিত। সর্দারেরা মেয়ে পুরুষে অনেক বেলা পর্যন্ত পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইত, কেহ কিছু বলিলে বা তিরস্কার করিলে নীরবে মুখ টিপিয়া হাসিত। মনে হইত যেন তাহাদের গোষ্ঠিজীবনের মর্মকেন্দ্রে এমন এক অপরূপ সম্পদ নিহিত আছে যাহার তুলনায় জীবিকার্জন বা জমিদার মহাজনের তুষ্টিসাধন অতি তুচ্ছ বস্তু। তাহাদের মুখের মৃদু হাসি যেন এই সম্পদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গ্রামের লোকের অজ্ঞতাকে নীরবে ব্যঙ্গ করিত। রঙ্গু সর্দারের মা আমাদের বাড়ী দুইবেলা বাসন মাজিত। বেশ মনে আছে, একদিন এইরূপ উৎসবরাত্রির পর ভোরবেলা আসিয়া কাজ সারিয়া আর সে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারে নাই ; ক্লান্ত অবসন্ন দেহে আমাদেরই উঠানে পড়িয়া বেলা বারোটা পর্যন্ত নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিয়াছিল। মায়ের অসন্তুষ্ট ভর্ৎসনা বা রৌদ্রের প্রখরতা—কিছুই তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই।

নবান্নের পর প্রথম যে পূর্ণিমা পড়িত সেইদিন সর্দার পাড়ার 'বড় পরব' অনুষ্ঠিত হইত। এই উদ্দাম উৎসবের রসদ যোগাইবার জন্য প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব হইতে হাঁড়ি হাঁড়ি নূতন চালের ভাত পচাইয়া ভাঁড় ভাঁড় 'হাঁড়িয়া' প্রস্তুত হইত ; নূতন নূতন ধুতি ও শাড়ী কিনিয়া হলুদ রঙে ছোপাইবার ধুম পড়িয়া যাইত ;

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পুরাতন বর্শা ও তীরের ফলকে নূতন করিয়া শান পড়িত। তিন দিন তিন রাত্রি ধরিয়া উৎসব চলিত; তিন কুড়ি মাদলে একসঙ্গে ঘা পড়িত,—গ্রামের বুক গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। সমগ্র সর্দার পাড়া গ্রামজীবনের অভ্যস্ত ধারার সহিত সংযোগ হারাইয়া আত্মকেন্দ্রিক আনন্দে মাতিয়া উঠিত। পরবের এই কয়টি দিন গ্রামের লোক পারত পক্ষে সর্দার পাড়ার মাটি মাড়াইত না; নীলা নদীর পলিমাটির পোষমানা জীব তাহারা; এই অপরিচিত বন্য উৎসবের মধ্যে কোথায় যেন একটা হিংস্রতার আভাস পাইয়া শিহরিয়া উঠিত। জেলা বোর্ডের পথ ধরিয়া যে সব বিদেশী পথিক চলিত, তাহারা হয়তো ক্ষণকালের জন্য একটু থমকিয়া দাঁড়াইত, কিন্তু সর্দার পাড়ার বারুণীরক্তিম দৃষ্টি ও উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ-তাণ্ডব তাহাদিগকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিত; একটু দ্রুততর গতিতেই তাহারা পুনরায় পথ চলিতে শুরু করিত।

পরবের প্রথম দিন ভোরবেলায় শিকার যাত্রা হইত। পাড়ার সমস্ত পুরুষ তীর-ধনুক ও বর্শা-বল্লমে সুসজ্জিত হইয়া উৎসাহ-কলরবে গ্রামপথ মুখরিত করিয়া বাহির হইয়া পড়িত,—শয্যাশায়ী রোগী ও জরাগ্রস্ত অশক্ত বৃদ্ধ ব্যতীত কেহই ঘরে থাকিত না। বালকেব দল পর্যন্ত গুল্‌তি ও লাঠি হাতে বড়দেব সঙ্গ লইত। কোনবার তাহারা যাইত হাঁটুভাঙার চরের বিস্তীর্ণ কাশ-কসাড়েব জঙ্গলে, কোনবার বা যাইত মরাগাঙের ওপারে মাঠের ধারের ঝাউবনে। ফিরিত বেলা তিনটায়;—সঙ্গে লইয়া আসিত গাদা গাদা পাখী আব গুটি দুই তিন বিশালকায় বন্য বরাহের মৃতদেহ। তাহাব পর শিকারীর দল স্নান ও জলযোগ সারিয়া একটু জিরাইয়া লইত; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছোপানো নূতন কাপড় পরিয়া সাজিয়া আসিয়া একত্র সমবেত হইত; বড় বড় হাঁড়িতে করিয়া মাংস উনানে চাপাইয়া দেওয়া হইত; হাঁড়িয়ার ভাঁড় বাহির হইত; মাদলে ঘা পড়িত। পরবের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হইত।

আমার তখন একটু বয়স হইয়াছে। স্কুলে পড়ি; কেতাবী বিদ্যার কল্যাণে ও বন্ধু-বান্ধবদের নর্মালাপের ফলে কিছু কিছু চোখমুখ ফুটিয়াছে। কৌতূহল বাড়িয়াছে; সাহসও বাড়িয়াছে। হঠাৎ দুই বন্ধুতে স্থির করিয়া ফেলিলাম, এবার বড় পরবের দিন রাত্রে সর্দার পাড়ায় গিয়া স্বচক্ষে সব দেখিয়া আসিতে হইবে। বাবা বাড়ী ছিলেন না; জুরীর শমন পাইয়া জেলার সদরে গিয়াছিলেন। মাকে ফাঁকি দিয়া বাড়ীর বাহির হওয়া বিশেষ কিছু কঠিন ছিল না। মা ছিলেন ঘুমকাতুরে মানুষ, একবার ঘুমাইয়া পড়িলে আর সহজে জাগিতেন না।

পরবের দিন আসিয়া পড়িল। রাত্রে যথাসময়ে দরজায় টোকা পড়িল; বন্ধু আসিয়াছে। ধীরে ধীরে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরের বাহির হইয়া আসিলাম ও সন্তর্পণে দরজা ভেজাইয়া রাখিয়া দুইজনে রওনা হইয়া পড়িলাম। হেমন্তের পূর্ণিমা। আকাশে জ্যোৎস্নার জোয়ার আসিয়াছে। বাতাসে অল্প শীতের আমেজ; পায়ের তলায় শিশির-ভেজা ঘাসের হিমস্পর্শ। পাড়ার অধিকাংশ বাড়ীতেই প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে, শুধু পুকুরের ওপারে শিরোমণি মহাশয়ের বৈঠকখানায় তখনো আলো জ্বলিতেছে,—দাবার আসর তখনো বোধ হয় শেষ হয় নাই। পাড়ার মধ্যে সম্পূর্ণ নীরবতা থম্ থম্ করিতেছে, কিন্তু দক্ষিণে সর্দারদের মাদলের ধ্বনি উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে; সুস্থির নৈঃশব্দের কূলে আসিয়া ধ্বনিতরঙ্গ আছড়াইয়া পড়িতেছে।

রাখহরি সর্দারপাড়ার মধ্যে সবচেয়ে সম্পন্ন গৃহস্থ। তাহার বাড়ীর পাশের খোলা প্রান্তরের উপর পরবের জমায়েৎ বসিয়াছে। আমরা চুপি চুপি পথ হইতে নামিয়া একটা গাছের ছায়ার নীচে গা ঢাকা দিয়া বসিলাম। প্রান্তরের মধ্যস্থলে শুক্‌নো ডালপালা ও নাড়ার গাদায় আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আর কোথাও কোন আলো নাই। প্রদীপ্ত আলোকচক্রের মধ্যে সারি সারি

হাঁড়িয়ার ভাঁড় সাজানো রহিয়াছে। তাহার একপাশে দীর্ঘ-বিন্যস্ত ঈষৎ অর্ধচন্দ্রাকৃতি শ্রেণীতে পরস্পরের সহিত বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সর্দারপাড়ার মেয়েরা নাচিতেছে। বৃদ্ধা যুবতী তরুণী কিশোরী —আজ আর কোন ভেদাভেদ নাই; সম্পর্ক-বিচার নাই, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই। মা-মেয়ে, শাশুড়ী-বৌ, দিদিমা-নাতিনী একসঙ্গে নাচিতেছে; হাঁড়িয়ার নেশায় চক্ষু ঘোর-ঘোর হইয়া উঠিয়াছে, নৃত্যের নেশায় সর্বাঙ্গ দুলিয়া উঠিতেছে। বহ্নিকুণ্ডের অপর পার্শ্বে বিশ পঁচিশ জন পুরুষ বর্শা-ফলকের ন্যায় ব্যূহ রচনা করিয়া মাদল বাজাইতেছে। তাহাদের নেতৃত্ব করিতেছে আমাদের দেবনাথ। মাথার বাবরি চুল সাজিমাটি দিয়া ঘসিয়া ধুইয়া ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া দিয়াছে, গলার তুলসীর মালা খুলিয়া ফেলিয়া তাহার পরিবর্তে আকন্দ ফুলের মালা পরিয়াছে, দুই কানে দুইটি ধুতরা ফুল গুঁজিয়া দিয়াছে, ডান পায়ে বড় এক গোছা ঘুঙুর বাঁধিয়া লইয়াছে। দুই হাতে মাদলে ঘা দিতেছে, স্কন্ধ বাহু বক্ষ ও পৃষ্ঠের পেশীগুলি ছন্দে ছন্দে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে, কালো দেহের উপর আলোকের দীপ্তি পড়িয়া যেন পিছলাইয়া যাইতেছে। মাদল বাজিতেছে,—দিপির দিপাং, দিপির দিপাং, দিপাং দিপাং, দিপির দিপাং। সমের মাথায় আসিয়া দেবনাথের সর্বশরীর চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে,—মাথা ঝাঁকাইয়া পায়ের ঘুঙুরে তাল দিতে দিতে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিতেছে,—হো—হো—হোহো—হো—হোঃ! হাতের নীচে মাদল উত্তাল হইয়া ওঠে; নর্তকীদের দেহান্দোলনে ঝড়ের আভাস জাগিয়া ওঠে।

এ আমি কোথায় আসিলাম? আমার সম্মুখে মাদল বাজাইতেছে নাচিতেছে, উহারা কে? উহাদিগকে কি সত্যই আমি চিনি? উহারা কি সত্যই আমার গ্রামের লোক? ঐ কি আমাদের দেবনাথ, যে প্রতিদিন আমাকে দেখিলেই দাদাঠাকুর বলিয়া ভক্তিতে গদগদ হইয়াওঠে? এখন যদি আমি উহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াই, তাহা

হইলে কি ও আমাকে চিনিতে পারিবে? —না, পরিচয়ের ছলনা আজ ঘুচিয়া গিয়াছে। কোন্ এক আদিম জগতের অজ্ঞাত জীবন-কেন্দ্র হইতে অপরিচিত আনন্দের প্রস্রবণ আজ উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। আর সেই আনন্দের ধারক ও বাহক যাহারা তাহাদের দেহ আমার চক্ষুর সম্মুখে রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের মন পিছাইয়া চলিয়া গিয়াছে সুদূর অতীতের দিকে। একটা নূতন জগতের তীরে দাঁড়াইয়া আমরা দুটি বালক কৌতূহলে বিস্ময়ে আনন্দে আতঙ্কে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছি।

আলোকচক্রটির বাহিরে চন্দ্রালোকিত প্রান্তরের উপর বহু নরনারীর আনাগোনা চলিতেছে। তাহাদের অস্ফুট কলরব শুনিতে শুনিতে ও আনন্দ-চাঞ্চল্যের মন্থর আবর্ত দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ আমার মন যেন মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। বন্ধুর দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম, তাহারও অনুরূপ অবস্থা। মাদল বাজিতেছে, সুমিষ্ট গম্ভীর নির্ঘোষে বায়ুমণ্ডল কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে; সর্দারনীরা নাচিতেছে, কখনো আগাইয়া আসিতেছে কখনো পিছাইয়া যাইতেছে, বাদ্যের তালে তালে দুলিতেছে, হেলিতেছে; হলুদ-রঙা আঁচল প্রজাপতির ডানার মত পিছনে ফর্ ফর্ করিয়া উড়িতেছে; খোঁপায় গোঁজা জবাফুল থর থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। তাহাদের পিছনে কালো কালো ছায়ার শ্রেণীও নাচিতেছে;—আলোছায়ার অস্থির কম্পনে দৃষ্টি বিভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছে।

যাহার খুসি সে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, নারিকেলের মালা কিংবা মাটির খুলিতে করিয়া হাঁড়িয়া ঢালিয়া লইয়া নিজে পান করিতেছে, অপরকে পান করাইতেছে। অন্নদা আজ মোহিনী মূর্তি ধারণ করিয়াছেন; মন্থন-বিক্ষুব্ধ সর্দার পাড়ায় লক্ষ্মীর পরিবর্তে উর্বশীর আবির্ভাব হইয়াছে। বহ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কেষ্ট সর্দারের পেটমোটা নাতিটা ঢক্ ঢক্ করিয়া হাঁড়িয়া

গিলিতেছে; একটু দূরে বসিয়া তাহার মা তাহার সদ্যোজাত শিশু কন্যাটিকে ঝিনুকে করিয়া হাঁড়িয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কোথা হইতে আলু থালু বেশে রতন বুড়ী ছুটিয়া আসিল, ছোট একটা মাটির ভাঁড়ে এক ভাঁড় হাঁড়িয়া ঢালিয়া বাদ্যরত দেবনাথের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

সহসা মাদলে তালফের্তার সঙ্কেত বাজিয়া উঠিল। সমবেত জনতার মধ্যে যেন একটু বেশী চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল; নর্তকীদের মুখে একটু মৃদু হাসির আভাস ফুটিল। তাহার পর শুনা গেল দেবনাথের সতেজ মধুর কণ্ঠ। দেবনাথ গান ধরিয়াছে। কিন্তু এ কি গান? এ কি সুর? এ কি ভাষা? হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ও অনুস্বার বিসর্গ বহুল এই অদ্ভুত অনার্য ভাষায় তো সর্দারদের কোন দিন কথা কহিতে শুনি নাই! নিজেদের মধ্যেও যে তাহারা বাংলা ছাড়া আর কোন ভাষা কখনো ব্যবহার করিয়া থাকে, এমন কথা তো কাহারও কাছে শুনি নাই! তবে আজ এ কি হইল? শুধু ভাষা নয়, গানের সুরও যেন কেমন বিচিত্র ধরণের; কেমন যেন এলাইয়া পড়া একঘেয়ে সকরুণ দীর্ঘশ্বাসের মত! আমরা যে বাংলাদেশের সহিত পরিচিত তাহার সহিত এ সঙ্গীতের কোথাও কোন সঙ্গতি নাই; সুখসুপ্ত ধানসোনা গ্রামের প্রান্তে যেন আজ কোন বিদেশী সমাজের বিদ্রোহ-ঘোষণা ইহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দেবনাথের কণ্ঠের পোষা সুর আজ একটু বেশী মাত্রায় তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে; অপরিচিত ভাষার অপ্রত্যাশিত ধ্বনি-সংমিশ্রণ কেমন একটু কর্কশ শুনাইতেছে। ফিরিয়া ফিরিয়া গানের একটি কলি সে তিন চার বার গাহিল; তাহার পর নর্তকীরা পরের কলিটি ধরিল,—তীক্ষ্ণ অথচ চাপা সুরের দোলায়মান গুঞ্জনধ্বনির মত। আবার সুর ফিরিয়া দেবনাথের কাছে আসিল। এবার অন্য মাদলীরাও তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে শুরু করিল।

কিন্তু দেবনাথের সুর রহিয়াছে চড়া পর্দায় বাঁধা ; অন্য সকলে ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে ভারী গলায় গাহিতেছে,—একটা বিরাট তানপুরার ঝঙ্কারের মত শুনাইতেছে। এমনি করিয়া মেয়ে পুরুষে সুর লইয়া লোফালুফি চলিতে লাগিল ; ক্রমে ক্রমে সর্দার পাড়াব সমস্ত নরনারী এই অদ্ভুত সঙ্গীতোৎসবে মাতিয়া উঠিল। নর্তকীরা নাচ থামাইয়া সুরের ছন্দে ছন্দে মৃদু মৃদু দুলিতে লাগিল। নেশার ঘোর জমাট হইয়া উঠিল। শুধু হাঁড়িয়ার নেশা নহে, সুরের পাখায় ভর করিয়া অতীত জীবন হইতে যে স্মৃতির নেশা উড়িয়া আসিয়াছে তাহাই যেন প্রবলতর !

সমগ্র সর্দার পাড়া স্বপ্ন দেখিতেছে। এই স্বপ্ন জাগিয়া উঠিয়াছে বিস্মৃতির অতল গহ্বর হইতে ; স্নায়ু ধমনী অস্থি মজ্জাব পথ বাহিয়া উঠিয়া আসিয়া মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বর্তমান সূর্যকর-বিদ্ধ কুয়াশার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, অতীত-স্মৃতির স্বপ্নই একমাত্র বাস্তব সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চাঁদের আলোর ইন্দ্রজাল সর্দার পাড়ার চেতনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে অবচেতনার গহন হইতে দলে দলে আদিম বন্য বর্বর মন উঠিয়া আসিয়াছে,—ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইতে চাহিতেছে অতীতের আশ্রয়-নীড়েব দিকে। দেবনাথ তাহাদের নেতৃত্ব করিবে, মাদল বাজাইয়া গান গাহিয়া তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে। প্রবাসী উপবাসী মন গৃহের অমৃত আস্বাদ করিয়া পুনরায় শান্তি লাভ করিবে।

মাদল বাজিতেছে, গানের সুর উঠিতেছে, পড়িতেছে ; সমগ্র সর্দার পাড়া সুরতরঙ্গে দুলিতে দুলিতে স্বপ্ন দেখিতেছে। ছোট ছোট পাহাড়ের শিলাসঙ্কুল সানুদেশ ভরিয়া শাল পিয়াশাল ও মহুয়ার বন ; তাহার মধ্যে ছোট ছোট পর্ণকুটির। ডালপাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো মাটির উপর কুহকের নক্‌সা বুনিয়া দিয়াছে। রুক্ষ বন্ধুর জমিতে ভুট্টা জোয়াড় ও গোহুমের ক্ষেত্রে

সার্থক পরিশ্রমের সোনালি সফল ফলিয়াছে। ক্ষীণকায়া পার্বত্য স্রোতস্বিনীর প্রবাহ-কিঙ্কিনীর সহিত বনমর্মর মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব মূর্ছনার সৃষ্টি করিয়াছে। কচি কচি শালপাতার চিক্কণ শ্যামলতার মধ্যে প্রদীপ্ত যৌবনের ইঙ্গিত; পলাশের ফুলে ফুলে বহ্নিশিখার আভাস; বাতাসে মহুয়া ফুলের মাদক সুরভি। ছায়াচ্ছন্ন বনভূমির মধ্যে বন্যবরাহের ঘুৎকার, প্রচ্ছন্ন চিতার নিঃশব্দ পদসঞ্চার। শিকারের উন্মাদ আনন্দ; নৃত্যোৎসবের উত্তেজনাময় সঙ্কেত; প্রেম পূর্বরাগ মিলন বিরহের অফুরন্ত বৈচিত্র্য। অরণ্যভূমির মধ্য হইতে বাঁশীর সুব শুনা যাইতেছে,—যেঁ বাঁশী একদিন তাহাদেব হাতে ছিল, যে বাঁশী আজ তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। বাঁশীতে আহ্বান-সঙ্কেত বাজিতেছে,—ফিরে আয়! ওরে, ফিরে আয়! সর্দার পাড়ার মন উচাটন হইয়া উঠিয়াছে। পিতৃপিতামহের শোণিতধারায় যে স্বপ্ন এতদিন ঘুমাইয়া ছিল, মাদলের মাতনের মধ্যে আজ তাহা আবার জাগিয়া উঠিয়াছে।

পাঁচ ছয়দিন পরে দেবনাথকে আবার দেখিলাম, শিরোমণি মহাশয়ের ঘাটলায় বসিয়া নিজের মনে গান গাহিতেছে। তৈল-নিষিক্ত কেশদাম মাথার উপব পরিপাটিরূপে সুবিন্যস্ত, গলায় ত্রিকণ্ঠি তুলসীব মালা, মুখে সেই পুরাতন প্রশান্ত হাসি। দেবনাথ গাহিতেছিল,—

হরি দুখ দাও যেজনারে,
ও তার কপালে নাই সুখ, বহ্মাণ্ড বৈমুখ,
দুখ বিনে সুখ নাই এ সংসারে।
ও সে জলে বাঁধলে ঘর জলে জ্বলে আগুন,
পোড়ে কোঠা বাড়ী ছোটে টালি চুণ—

আমাকে দেখিয়াই বিনীত ভাবে হেঁট হইয়া জোড়হাত কপালে ঠেকাইয়া ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল,—এই যে, দাদাঠাকুর, পন্নাম হই।

কোথায় যেন একটা ফুল ফুটিয়াছে!

খালি দাওয়ায় ধূলার উপর শীতের সুমিষ্ট রৌদ্রে পিঠ দিয়া হাবা উপুড় হইয়া শুইয়া ছিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, কোথায় যেন একটা ফুল ফুটিয়াছে। পদ্মফুল সে দেখিয়াছে, পূজার সময় মিত্তির বাড়ী ঝুড়ি ঝুড়ি আসে;—সেই রকম? না, তার চাইতে অনেক বড়। কিন্তু জবাফুলের মত টক্‌টকে লাল রঙ্, আর কেমন যেন একটা তীব্র, মধুর অথচ গাঢ় সুগন্ধ। হাবা একটু অস্থিরভাবে নড়িয়া চড়িয়া শুইল।

হাবার জীবনের পনেরটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে এক নিরবচ্ছিন্ন গোধূলির অস্পষ্টতার মধ্যে। সেখানে দিবালোকের সংশয়-হীনতাও নাই, অন্ধকারের আত্মবিলুপ্তিও নাই। তাহার জগতে কোনদিন কল্পলোকের চন্দ্রকিরণ অপ্রাকৃত সৌন্দর্যের মায়াতুলিকা বুলাইয়া দেয় নাই। তাহার চেতনার চারিদিক যেন একটা অস্বচ্ছ কুয়াশার জাল দিয়া ঘেরা। কিন্তু এই কুয়াশার ভিতরে মাঝে মাঝে হাবা যেন কাহার অঙ্গুলির ইসারা দেখিতে পায়; মলিন মেঘ টুটিয়া তাহার মনের আকাশে মাঝে মাঝে কিসের বিদ্যুৎ চমকিয়া ওঠে। এমনি আকারে ইঙ্গিতে আভাসে অনুভাবে এই জড়বুদ্ধি বালক তাহার পৃথিবীকে চিনিয়াছে।

পৃথিবী কিন্তু তাহাকে চিনিবার চেষ্টামাত্রও করে নাই। অথচ অন্ধ-বুদ্ধির নিঃসংশয় অহঙ্কারে তাহার নামকরণ করিয়াছে 'হাবা'।

নাঃ, ফুলটা বড় জ্বালাতন করিল তো! সেই অদৃশ্য কুসুমের সুমিষ্ট সুবাস যেন হাবার নাকের অতি কাছে কুণ্ডলি পাকাইয়া ঘুরিতেছে। তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। বুজিয়া-

থাকা চোখের ভিতরটাও যেন সেই ফুলের ঘোর লাল রঙের ধাক্কা খাইয়া জ্বালা করিতে লাগিল।

আজ সকালেই হাবা তাহার মার কাছে একদফা মার খাইয়াছে। তাহার তির্যগ্-দৃষ্টি বুদ্ধি দিয়া সে নিজের অপরাধ খুঁজিয়া পায় নাই সত্য, কিন্তু বিনা কারণে পুঁটিকে উঁচু দাওয়া হইতে উঠানে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়াকে মা মার্জনার চক্ষুতে দেখিতে পারেন নাই। অবশ্য এখন আর সে জন্য হাবার মনে মার বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ সঞ্চিত নাই। মার নিকট হইতে ক্ষুধা পাইলে আহার ও কারণে অকারণে প্রহার প্রাপ্তিই সে স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। পাগ্‌লা পৃথিবীটার চালচলন সম্বন্ধে আজকাল হাবার মনে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। বেশ নির্বিবাদে নিজের খেয়ালে চলিতে চলিতে হঠাৎ মোড় ফিরিয়া হাবাকে একটা আঘাত হানিয়া যাওয়াই যেন তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ। কিন্তু তথাপি মাঝে মাঝে আঘাতটা আসিয়া পৌঁছায় বড় অপ্রত্যাশিত ভাবে। তখন হাবার চেতনার সক্রিয় অংশটুকু সহসা অসাড় হইয়া যায়, আর প্রহৃত কুক্কুরের মত উচ্চ আর্তনাদের মধ্য দিয়া যে বেদনা-বোধকে সে প্রকাশ করে, তাহার মধ্যে আর যাহাই থাকুক না কেন অন্য কাহারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে না। তাহার ক্রন্দন কখনো নালিশ হইয়া ওঠে না।

কিন্তু ফুলটা তাহার অশরীরী বর্ণ-গন্ধ দিয়া হাবাকে আজ তাহার বিশ্রাম-সুখ হইতে বঞ্চিত করিল। সে দাওয়া হইতে উঠিল,—উঠিয়া অন্যমনস্কভাবে ঠাকুরঘরের কাছে গেল।—নাঃ, এতো পূজার ফুলের গন্ধ নয়। এ গন্ধে তো মন হালকা হয় না, বরং যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ হয়,—কেমন যেন একটা ভারী সুগন্ধ, বুকের উপর দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া চলে। হাবা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। কিন্তু কাছে পিঠে ফুল তো কোথাও নাই!

অথচ সে যে সেই মস্ত বড় ফুলটার গাঢ় লাল রঙটি পর্যন্ত যেন স্পষ্ট চোখে দেখিতে পাইতেছে!······বিনা কারণে হাবার মনে হইল যেন খুব খানিকটা চেঁচাইতে পারিলে কিংবা ছুটিতে পারিলে কিংবা হাত পা ছুড়িতে পারিলে তাহার মনের এই অস্বস্তির গুমোটটা কাটিয়া যাইবে।······ফুলটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে!

বাঁশঝাড়ের তলা দিয়া যে সুঁড়ি পথটা মুখুজ্জে বাড়ীর দিকে গিয়াছে সেইটা ধরিয়া হাবা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। অন্যমনস্কভাবে বাঁশতলা হইতে একটা সরু কঞ্চি তুলিয়া লইয়া পথের ধারের কচু গাছের ঝোপগুলিকে পিটাইতে পিটাইতে উদ্দেশ্যহীন ভাবে অগ্রসর হইয়া চলিল। কিছুদূর গিয়া হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল পথের ধূলার মধ্যে কি একটা চক্ চক্ করিতেছে। জিনিসটা বিশেষ কিছুই নয়,—একখানি আধভাঙা ত্রিশিরা কাচ। দেখিয়াই হাবার বুকের ভিতরটা যেন ধ্বক্ করিয়া উঠিল। মনে হইল বুঝি এতক্ষণ ধরিয়া সে যাহা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল তাহা এইবার পাইয়াছে। অস্বাভাবিক লুব্ধ আগ্রহের সহিত কাচের টুকরাটিকে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া হাবা সেটিকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর মুখের একটা অদ্ভুত বিকৃত ভঙ্গি করিয়া একটি চোখ বুজিয়া আর এক চোখের সামনে কাচখানিকে ধরিল। কিন্তু পৃথিবীর এই বিচিত্র সাতরঙা রূপ মাত্র এক মুহূর্তের জন্য তাহাকে বিস্মিত ও পুলকিত করিল। তাহার পরই আশাভঙ্গের নিদারুণ প্রতিঘাতে তাহার মনের ভিতরটা ক্ষোভে ও দুঃখে ভরিয়া উঠিল। সে টান মারিয়া কাচখানাকে দূরে ফেলিয়া দিল।

কি যে সে চাহিয়াছিল তাহা সে নিজেই ভালো করিয়া বুঝে নাই। বোধ হয় সেই গাঢ় রক্তবর্ণ ফুলটিকে, যাহার সুবাস তখনও নেশার মত তাহার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। কিন্তু কি করিয়া যে তাহা সম্ভব হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিবার শক্তি তাহার

ছিল না; পৃথিবী তাহার কাছে তখনো সংখ্যাতীত সম্ভাবনার ভাণ্ডার।

হাবার বুকের ভিতরে কি যেন একটা ওলট্‌-পালট্‌ চলিতে লাগিল।—কিন্তু সে জানে ইহার মধ্যে কোথায় একটা ফাঁকি আছে। যে ফুল সে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এখানে তাহা নাই। সামনে চিরদিনকার পরিচিত ক্ষেন্তি দাঁড়াইয়া চিরদিনকার পরিচিত বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে। হাবার মনের মধ্যে একটা অন্ধ ক্রোধ সহসা সাপের মত ফোঁস্‌ করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। হাতের কঞ্চিগাছা ভালো করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া সে সপাং করিয়া ক্ষেন্তির পিঠে সজোরে এক ঘা বসাইয়া দিল। ক্ষেন্তি প্রথমটা অবাক হইয়া গেল। হাবা বুদ্ধিহীন বটে কিন্তু তাহাকে সে নিরীহ বলিয়াই জানিত। সে যে তাহাকে মারিতে পারে—অত রাগিয়া, এত জোরে মারিতে পারে—তাহা সে কোনদিনই ভাবে নাই। চীৎকার করিয়া কাঁদিবার বয়স ক্ষেন্তির গিয়াছে, নীরবে তাহার চক্ষু হইতে টস্‌ টস্‌ করিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। কিন্তু সে ছুটিয়া পলাইল না, সেইখানেই নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া হাবার দিকে চাহিয়া রহিল। যাহার সঙ্গে সে শৈশব হইতে খেলাধূলা করিয়া মানুষ হইয়াছে, যাহার দুর্বল ইচ্ছাশক্তিকে সে চিরকাল নিজের অভিলাষ মত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, যাহাকে সে পোষা কুকুর-ছানাটির মত একান্ত নিজের জিনিস বলিয়াই জানিত,—সেই হাবা তাহাকে আজ মারিল! হাবার হাতের আঘাত ক্ষেন্তির শুধু পিঠের উপরে পড়ে নাই, মনের উপরেও পড়িয়াছিল।

হাবা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্ষেন্তির এই নির্বাক্‌ ক্রন্দন দেখিল। রাগ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পড়িয়া গিয়াছিল। এখন যেন কি একটা তাহার বুক হইতে গলার দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হইল। সঙ্গে সঙ্গে আবার সর্বশরীরের, সমস্ত চেতনার সেই পুরাতন অস্বস্তি দশগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার সেই

প্রকাণ্ড ফুলটার একটা পাপ্‌ড়ি কেমন বিবর্ণ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে,—এখনই বুঝি খসিয়া পড়িবে। না,—আর তাহার বিলম্ব করিলে চলিবে না। ফুলটার সন্ধান তাহাকে করিতেই হইবে। হঠাৎ হাবা চঞ্চলপদে ক্ষেন্তিকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সমস্ত দুপুর দিশাহারার মত গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া অবশেষে যখন সে শিরোমণি মহাশয়ের পুকুর ঘাটে আসিয়া বসিল তখন বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে। পাড়ার বৌঝিরা গা ধুইবার জন্য একে একে ঘাটে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। হাবাকে সকলেই চেনে, জড়বুদ্ধি বলিয়া একটু কৃপার চোখেও দেখে;—তাহার সামনে কিশোরী হইতে প্রৌঢ়া কাহারও কিছু লজ্জা করিবার নাই। হাবা বসিয়া বসিয়া নিতান্ত নির্বিকার নয়নে তাহাদের স্নানলীলা দেখিতে লাগিল। সে যে কি জন্য আজ বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছে;—সেই অন্তরীক্ষচারী ফুলটিকে সে তাহার চেতনার সঙ্কীর্ণ রাজত্ব হইতে হারাইয়া ফেলিয়াছে। অবচেতন মনের উপর হয়তো তখনো তাহার বর্ণগন্ধের ক্রিয়া চলিতেছিল, কিন্তু শরীরের সেই অস্বস্তির গুমোট কাটিয়া গিয়া তাহার স্থলে আসিয়াছে অবসাদের ক্লান্তি। ঘাটের রানার উপর বসিয়া পড়িয়া আর তাহার উঠিবার কথা মনে নাই।

বড়াল বাড়ীর লক্ষ্মী ছোট খুড়ীর সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি গল্প করিতেছে, আর হাসিতেছে। মেয়েটার সেদিন বিবাহ হইয়াছে। হাবা নিমন্ত্রণ খাইয়াছিল,—এক কোপনস্বভাব বৃদ্ধ বরযাত্রীর হাতে কানমলাও খাইয়াছিল।····· লক্ষ্মী কেমন এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া কথা বলিতেছে, জলে অর্ধনিমগ্ন দেহটাও কেমন এক রকম করিয়া দুলাইতেছে; কানের দুল চিক্ চিক্ করিতেছে, হাতের চুড়ি রিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিতেছে। হাবার মন অলস বিরক্তির রসে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময় ঘাট

হইতে উঠিয়া কুসুম ডাকিল,—এখানে বসে বসে কি করছিস হাবা? চল্, বাড়ী চল্।

কুসুম হাবাদের পাশের বাড়ীর মেয়ে। সেই অধিকারে সেও হাবার উপর খানিকটা প্রভুত্ব খাটায়।

হাবা নিরুত্তরে উঠিয়া কুসুমের পিছু পিছু চলিল। ভিজা কাপড় কুসুমের সর্বাঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে, সেইজন্য তাহাকে অন্য সময়ের চেয়ে একটু বেশী লম্বা, একটু বেশী রোগা দেখাইতেছে। পথের উপর দিয়া সোজা না চলিয়া সে কেমন আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছে,—চকিত ভাবে একবার ডাহিনে একবার বামে চাহিতেছে। এই চলিবার ভঙ্গিটা হঠাৎ হাবার অত্যন্ত পরিচিত বলিয়া মনে হইল—কুসুম নিজে যতটা পরিচিত তাহার চেয়েও যেন বেশী। এ কি সত্যই কুসুম, না আর কেউ? হাবা তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া কুসুমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কুসুম থামিয়া পড়িল, তাহার পর বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—কি রে!—অমন করে চেয়ে রইলি যে? পথ ছাড়্! চল্, বাড়ী চল্!—তোর আজ হয়েছে কি? সকাল বেলা ক্ষেন্তিকে মারলি, আবার—

সহসা সে হাবার চোখের দিকে চাহিয়া কি দেখিল কে জানে,—প্রশ্ন অসমাপ্ত রাখিয়াই দ্রুত পদক্ষেপে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

ঠিক হইয়াছে! এইবার হাবার মনে পড়িয়াছে। ইহাকে অনেকটা যেন ক্ষেন্তির মত দেখাইতেছে।...আজ সে ক্ষেন্তিকে মারিয়াছে। বেশ করিয়াছে, আবারও মারিবে। তাহাতে কাহার কি হইয়াছে? কুসুম সে কথা বলিবে কেন? হাবার ইচ্ছা হইল কুসুমকেও এক ঘা বসাইয়া দেয়;—কিন্তু হাতের কঞ্চিটা সে কোথায় ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছে। তাহা ছাড়া এখনই বাড়ীতে ফিরিতে হইবে; আবার কুসুমকে মারিয়াছে শুনিলে মা আর তাহাকে আস্ত রাখিবেন না।......কিন্তু ক্ষেন্তিকে সে আবার পাইলে আবারও মারিবে।

বাড়ী ঢুকিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। তাহাদের শয়নঘরের দাওয়ায় হাবার ছোট ভাইকে কোলে করিয়া ক্ষেন্তি বসিয়া আছে। হাবাকে যেন দেখিয়াও দেখিল না, যেমন খোকার সঙ্গে খেলা করিতেছিল তেমনি খেলা করিতে লাগিল। হাবাও অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সটান ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার কান্না পাইতেছিল। ক্ষেন্তি রোজ তাহার সঙ্গে খেলা করে, গল্প করে ; আজ সে খোকাকে লইয়াই ব্যস্ত,—তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। কি করিয়াছে সে ? শুধু এক ঘা মারিয়াছে বৈ তো নয়! অমন কত মার তো সে নিজে রোজ খায়,—তাহাতে কি হইয়াছে ? আর তো কোনদিন সে ক্ষেন্তিকে মারিবে না !

ঘরের ভিতরেও হাবা বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না। বাহির হইয়া ক্ষেন্তি যেখানে বসিয়াছিল তাহারই আশে পাশে বিনা কারণে ঘুরঘুর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে ক্ষেন্তিকে মারিয়াছে, ক্ষেন্তিও তাহাকে মারিল না কেন ?—একটু দূরে দাওয়ার উপর বসিয়া কাতর দৃষ্টি মেলিয়া সে ক্ষেন্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্ষেন্তি পা ছড়াইয়া খোকাকে কোলে লইয়া বসিয়াছে। তুলিয়া তুলিয়া সুর করিয়া বলিতেছে,—

দোলে দোলে খোকন দোলে,
বাঁশের ঝাড়ে জোনাক জ্বলে ;
কুঁড়ে ঘরে চাঁদের কোনা,
দোলে আমার খোকন সোনা।—

খোকাও তালে তালে তুলিতেছে আর মাঝে মাঝে অর্থহীন আনন্দের হাসি হাসিতেছে। ক্ষেন্তি ফিরিয়া ফিরিয়া বার বার একই ছড়ার পুনরাবৃত্তি করিতেছে ; একঘেয়ে সুরের মোহ আসিয়া হাবার মনে কেমন একটা বিষণ্ণ শ্রান্তির ভাব জাগাইয়া দিতেছে।··· সর্বশরীর শিথিল করিয়া দিয়া সেও ধীরে ধীরে ছড়ার তালের সঙ্গে দুলিতে শুরু করিয়া দিল।

ক্ষেন্তি আড়চোখে সবই দেখিতেছিল আর এই অর্ধ-অনুতপ্ত, অর্ধ-অভিমানী জীবটির রকম-সকম দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিল। তাহার শ্রান্ত দেহভঙ্গি ও করুণ দৃষ্টি দেখিয়া এইবার তাহার মনে বড় মমতা হইল। কণ্ঠস্বরে অনেকখানি কোমলতা ঢালিয়া দিয়া সে ডাকিল,—এখানে আয় না হাবা আমার কাছে এসে বোস্।

হাবা কৃতার্থ হইয়া গেল। অপরাধের সবখানি গ্লানি এক নিমেষে নিঃশেষে মুছিয়া গেল; নির্মল আনন্দে মন ভরিয়া উঠিল। ছুটিয়া ক্ষেন্তির পাশে গিয়া তাহার হাঁটুর ধারে মাথা রাখিয়া ধূলার উপরেই শুইয়া পড়িল। দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া বুঝি-বা আনন্দের আতিশয্যেই হাবা কাঁদিয়া ফেলিল। ক্ষেন্তি সবই মনে মনে বুঝিল; একটু হাসিয়া বাঁ হাতখানি হাবার পিঠের উপর রাখিল। এই আদরের স্পর্শে হাবা একেবারে গলিয়া গেল; —আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া শুইয়া ক্ষেন্তির মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার হাতখানি লইয়া খেলা করিতে লাগিল। তখনও তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুর চিহ্ন মিলাইয়া যায় নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে মুখে একটা অত্যন্ত করুণ নির্বোধ হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

······ক্ষেন্তির হাতখানা কি নরম! ঈষৎ রক্তাভ করতল হইতে একটা মৃদু উষ্ণতা বাহির হইতেছে। মণিবন্ধের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের উপর দু'গাছি সরু সোনার চুড়ি ঝিকৃমিক্ করিতেছে। চাহিয়া চাহিয়া হাবার চোখে যেন নেশার ঘোর লাগিল। সে ক্ষেন্তির হাতখানি নিজের কপালের উপর চাপিয়া ধরিয়া চোখ বুজিল।

সহসা কিসের তীব্র সুগন্ধে হাবার দেহ-মনের সব অবসাদ এক মুহূর্তে কাটিয়া গেল। অননুভূতপূর্ব প্রদাহ ও ঔজ্জ্বল্য লইয়া সেই হারানো ফুলটি আবার তাহার চেতনার রাজ্যে ফুটিয়া

উঠিয়াছে। একটা টক্‌টকে লাল রঙের পর্দা বিশ্বের সমস্ত আলোক আড়াল করিয়া হাবার মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখে দুলিতে লাগিল। তাহার মন কি যেন প্রয়োজনের তাগিদে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল সমস্ত ব্যাপারটাকে তলাইয়া বুঝিতে,—এই অনাবিষ্কৃত অনুভূতির রাজ্যে বুদ্ধির একটা আলোকরশ্মি ফেলিতে কিন্তু অক্ষম মস্তিষ্ক অন্ধকারের মধ্যে পথ হাতড়াইয়া মরিতে লাগিল,—দিশা নাই, আলো নাই। শুধু রক্তস্রোতে একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য। হৃৎপিণ্ডটা যেন এই সমস্যার দ্বারে সজোরে আছড়াইয়া মরিতেছে! হাবার কপালে ঘাম ফুটিয়া উঠিল।—কিন্তু ফুলটাকে তাহার এখনই পাওয়া চাই-ই, না হইলে হয়তো আবার কোথায় হারাইয়া যাইবে! হাবা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ক্ষেন্তির হাতখানাকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া একদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার উদগ্র দৃষ্টির সম্মুখে ক্ষেন্তির মূর্তি মিলাইয়া গেল। সেইখানে ফুটিয়া রহিয়াছে তাহার সেই ফুল, যাহার সন্ধানে আজ দুপুরে সমস্ত গ্রামখানা সে ঘুরিয়া আসিয়াছে,—রক্তের মত টক্‌টকে লাল যাহার রঙ, দুঃসহ মধুর যাহার সুতীব্র সৌরভ। একটিমাত্র নির্বাক্ উল্লাসধ্বনিতে যেন হাবার সমগ্র সত্তা ফাটিয়া পড়িতে চাহিল,—পাইয়াছি, পাইয়াছি!

ঐ ফুলটিকে যদি সে আজ করায়ত্ত করিতে পারে তাহা হইলে বোধ হয় এক বিপুল পুলকের উচ্ছ্বাসে তাহার সমস্ত অস্তিত্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া রঙীন কাচের টুকরার মত ছড়াইয়া পড়িবে। হাবার মনের অসীম লোভ, অপরিসীম আগ্রহ কেবলমাত্র এক তীব্র স্নায়বিক চাঞ্চল্যে রূপান্তরিত হইয়া গেল। শরীরের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তার পিছনে তাহার মোহাবিষ্ট মন নির্জীব অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

ক্ষেন্তি চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, হাবার মুখচোখের ভাব একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। কুৎসিত মুখখানায় উগ্র লোলুপতার ছাপ। চোখে একটা হিংস্র চাহনি,—তীব্র আকাঙ্ক্ষার আলোকে শাণিত হইয়া উঠিয়াছে। মুখের কতকগুলা বিশ্রী রেখা গভীর, সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। তাহার উপর হাবা হাসিতেছে। কি কদর্য সে হাসি! উপরের ঠোঁটটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, আর শিকারের সম্মুখীন শ্বাপদের ন্যায় দাঁত বাহির হইয়া পড়িতেছে। কপালে দুইটি শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে; অস্বাভাবিক উত্তেজনায় মুখের রঙ কালো হইয়া উঠিয়াছে। ভয়ে ক্ষেন্তি আড়ষ্ট হইয়া গেল, নিজের হাত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হাবার বজ্রমুষ্টি শিথিল করিতে পারিল না।.........হাবার কপালে স্বেদবিন্দুগুলি চক্‌চক্ করিতেছে, বিস্ফারিত দুই চক্ষু যেন কোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, মুখের অবিচল হাসি আরও বিকট হইয়া উঠিয়াছে। ধীরে—অতি ধীরে হাবা তাহার দক্ষিণ হস্ত ক্ষেন্তির দিকে প্রসারিত করিয়া দিতে লাগিল;—হাতের আঙুলগুলা কেমন এক ভীতিজনক ভঙ্গিতে বাঁকিয়া উঠিয়াছে।

নিদারুণ আতঙ্কে ক্ষেন্তি চীৎকার করিয়া উঠিল।......

ইহার পর হইতে হাবাকে একটা লোহার শিকল দিয়া দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হইত। সে নাকি একেবারেই ক্ষেপিয়া গিয়াছিল।

পূবপাড়ার মধুসূদন চৌধুরী মহাশয়ের বৃদ্ধ বয়সে চরিত্র খারাপ হইয়া গেল।

চৌধুরী মহাশয় অশিক্ষিত নহেন,—সেকালের ছাত্রবৃত্তি পাশ। এখনও 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের সম্পূর্ণ প্রথম সর্গটি অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারেন। মহকুমা আদালতে পেশকারের কাজ করিতেন, দশ বার বৎসর হইল পেন্‌সন লইয়া বাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছেন। স্ত্রী বহুদিন পূর্বে গত হইয়াছেন। তিনটি পুত্র। সকলেই কৃতবিদ্য, চাকুরি উপলক্ষে সপরিবারে বিদেশে বাস করে। সংসারে এক বিধবা ভগ্নী ব্যতীত আর কেহই নাই। আর্থিক অবস্থা গ্রাম্য মান অনুযায়ী যথেষ্ট সচ্ছলই বলিতে হইবে, কারণ নিজের পেন্‌সন তো আছেই, তাহার উপর তিন পুত্রই নিয়মিত মাসোহারা পাঠাইয়া থাকে। চৌধুরী মহাশয়ের বয়স এখন প্রায় সত্তর। কিন্তু বার্ধক্য তাঁহাকে বিশেষ কাবু করিতে পারে নাই। মেদলেশ-বিবর্জিত হ্রস্বকায় মানুষটির মধ্যে আমরা কোনদিন জরা-জনিত দুর্বলতা বা অবসাদের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাই নাই। প্রায় প্রত্যহই দেখিতে পাইতাম, মাথার চক্‌চকে টাকটিকে একখানি পাট করা গামছা দিয়া ঢাকিয়া পরিধানের পরিচ্ছন্ন ধুতির কোঁচার খুঁটটি উল্‌টাইয়া তুলিয়া কোমরে গুঁজিয়া খালিগায়ে চটিজুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে চৌধুরী মহাশয় দুই মাইল পথ হাঁটিয়া বাজারে চলিয়াছেন। তবে ইদানীং তাঁহার দৃষ্টিশক্তি একটু ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। কোন কিছু ভালো করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইলে ডান হাতের করতলটিকে চোঙার মত করিয়া গুটাইয়া লইয়া দূরবীনের ন্যায় চোখে লাগাইয়া তাহার মধ্য দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেন।

গ্রামের মধ্যে স্পষ্টবক্তা বলিয়া চৌধুরী মহাশয়ের খ্যাতি ছিল। কথাটিকে অবশ্য গ্রাম্য অর্থেই বুঝিতে হইবে। ভদ্রতা বা চক্ষু-লজ্জার কোন ধার না ধারিয়া লোকের মুখের উপর কর্কশ বা অশ্লীল ভাষায় যথেষ্ট গালিগালাজ শুনাইয়া দিবার ক্ষমতা যাহার আছে, সে যদি জানিয়া শুনিয়া সত্যের অপলাপ না করে, তাহা হইলেই গ্রামের লোক তাহাকে স্পষ্টবক্তা বলিয়া খাতির করিতে ও ভয় করিতে শুরু করে। চৌধুরী মহাশয়ের এ ক্ষমতাটি পূর্ণমাত্রায় ছিল; মিথ্যা কথাও তিনি বড় একটা বলিতেন না। ইহার উপর তিনি আবার মুখে মুখে ছড়া বাঁধিতে পারিতেন। সুতরাং সোনায় সোহাগা-সংযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহার রচিত ছড়ার যে কয়টি এখনও মনে আছে তাহার অধিকাংশের মধ্যেই গ্রাম্যতাদোষ এত অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকট যে সেগুলিকে ছাপার অক্ষরে ভদ্রসমাজে উপস্থাপিত করা চলে না। অপেক্ষাকৃত নির্দোষ একটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এটি হইতে চৌধুরী মহাশয়ের জীবন-দর্শনের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

মধু-র বচন মিষ্টি-মধুর শুনতে সবাই চায়,
সত্যি কথায় ফোস্কা পড়ে সব বাবুদের গায়;
মধু-র ঘরে মজুত আছে অনেক মধুর জালা,
হুলের জ্বালায় বাপ্‌রে বলে পালায় যত শালা।

চাকুরি জীবনেই চৌধুরী মহাশয় মদ ধরিয়াছিলেন। ছেলেরা কর্মক্ষম হইয়া দেশ ছাড়িবার পর হইতে তিনি মদের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বাজারের আবগারী দোকানটির তিনিই ছিলেন প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক; প্রায় সারাদিনই নেশায় চুরচুরে হইয়া থাকিতেন। কিন্তু নেশার ঝোঁকে তাঁহাকে কোনদিন বেসামাল হইতে দেখি নাই,—একটু বকুনি বাড়িয়া যাইত, মুখের 'স্পষ্ট' কথা-গুলি আরও একটু স্পষ্টতর হইয়া উঠিত,—এইমাত্র। গ্রামের লোক

যেমন নির্বিবাদে সব কিছু মানিয়া লয়, তেমনি এই মস্তপ স্পষ্টবক্তা মধু চৌধুরীকেও মানিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু মাতাল হইলেও চৌধুরী মহাশয়ের চরিত্রদোষের কথা ইহার পূর্বে কখনো শুনা যায় নাই। হঠাৎ গ্রামশুদ্ধ লোক শুনিয়া অবাক হইয়া গেল যে এই সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আজকাল নিজের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া দিবসের প্রায় সর্বক্ষণই বাজারের পার্শ্বে অবস্থিত বেশ্যাপল্লীতে কাটাইতে শুরু করিয়াছেন। ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘর হইতে বাহির হইয়া সেখানে চলিয়া যান, আর ফেরেন রাত্রি ন'টা দশটার সময়। আহারাদি সেইখানেই সম্পন্ন করেন; বার কয়েক আবগারী দোকানে হানা দেওয়া ব্যতীত সমস্ত দিনের মধ্যে সেখান হইতে তাঁহাকে বাহিরে আসিতে দেখা যায় না।—সত্যই অবাক হইবার কথা, কারণ গ্রামের মধ্যে যাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য, নিতান্ত লুকাইয়া চুরাইয়া ব্যতীত তাঁহাদের কেহই ঐ নিষিদ্ধ পল্লীটিতে গতায়াত করিতে ভরসা পাইতেন না। ইহার পূর্বে এরূপ প্রকাশ্যভাবে কেহ কোনদিন সেখানে আস্তানা পাতেন নাই।

যথারীতি গ্রামসমাজে একটু চাঞ্চল্যের উদ্ভব হইল। যুবকের দল বুড়ো শালিখের ঘাড়ে এইরূপ রোঁয়া উঠিবার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া খুব হাসাহাসি করিতে লাগিল; প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। শ্রীধর কবিরাজ একদিন ভোরবেলা চৌধুরী মহাশয়কে পথের উপর পাকড়াও করিয়া তাঁহার আচরণ যে কতখানি অন্যায় হইতেছে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। মধু চৌধুরী অত্যন্ত প্রশান্ত ভাবে তাঁহার হাত হইতে হুঁকাটি ছিনাইয়া লইয়া একমনে তামাক খাইতে খাইতে তাঁহার সমস্ত কথা শুনিলেন এবং লম্বা একটি সুখটানের পর হুঁকাটি ফিরাইয়া দিয়া নাকমুখ দিয়া গল্ গল্ করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে নির্বিকার কণ্ঠে বলিলেন,—ছ্যাখো কব্রেজ, তিনকুড়ি দশের খেলা শেষ করে এসেছি, বয়েস তোমার চেয়ে অনেক বেশী;—অনেক দেখেছি, অনেক শিখেছি। আমার ওপর

আর গুরুগিরি ফলাতে এসো না। বামুন কায়েতের পাড়াতেই তো সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলাম,—তোমাদের ঠাকুরঘর বলো আঁস্তাকুড় বলো কিছুই আর চিনতে আমার বাকি নেই। লোকে তো বুড়ো বয়সে তীর্থে যায়,—আমি ঠিক করেছি, যে ক'টা দিন বেঁচে থাকবো ঐ পেশাকার পাড়ায় তীর্থবাস করবো। তোমাদের যদি কোন অসুবিধা হয়, মনে করো না কেন মধু চৌধুরী মরে গেছে! তাহলেই তো আপদ চুকে যায়।

বেচা মিত্তির দু'জনের অলক্ষ্যে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে এইবার বলিয়া উঠিল,—কিন্তু চৌধুরী মশায়, বেউশ্যের বাড়ী আপনি অন্নগ্রহণ করেন শুনলাম—

ব্যস্, আর যায় কোথায়! বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় মধু চৌধুরী ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষীণদৃষ্টি চোখে মুষ্টিবদ্ধ হস্তের দূরবীন লাগাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,— কে রে ব্যাটা! বেউশ্যে বেউশ্যে করে বড় গলায় কথা বলছিস্,—কে তুই?

—আজ্ঞে, আমি বেচারাম।

—ও! বেচা—বেচারাম মিত্তির। ওরে ব্যাটা বেচা, তোর যে গুষ্টিশুদ্ধু পচা। তার কোন খবর রাখিস তুই? ব্যাটা—চোর-কুঠ্রির চামচিকে, গড়ুরকে মারেন লাথি! তোর বাবা ছিল চোর—সিঁধেল চোর। বিধবা ভাদ্রবৌ-এর ঘরে সিঁধ দিয়ে তার গয়না চুরি করেছিল। আর বেউশ্যে বেউশ্যে কবছিস্,—তোর ঠাকুমা কি ছিল রে, হারামজাদা? ব্যাটা জলজ্যান্ত তামলির নাতি, কুলীন কায়েত সেজে মধু চৌধুরীকে জাত দেখাতে এসেছে।

দুইকানে আঙুল দিয়া বেচা মিত্তির ছুটিয়া পলাইল। ইহার পর আর কেহ এই দুর্মুখ মানুষটিকে ঘাঁটাইতে সাহস করে নাই। তিনি নিঃসঙ্কোচে বেশ্যালয়ে দিনযাপন ও অন্নজল গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সামাজিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কোন কথা কোথাও উঠিল না।

কিন্তু আগুন চাপা ছিল মাত্র, পূজার পূর্বে আত্মপ্রকাশ করিল। ঘোষ মিত্তির দত্ত তিনবাড়ীর বাবুরাই একত্র হইয়া স্থির করিলেন, এবার পূজায় মধু চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করা হইবে না। চৌধুরী মহাশয় দত্তবাবুদের নিকট জ্ঞাতি, কাজেই গায়ের জ্বালা তাঁহাদেরই বেশী ধরিয়াছিল। তাঁহারাই অগ্রণী হইয়া তাঁহার এইরূপ সামাজিক লাঞ্ছনার ব্যবস্থা করিলেন।

সংবাদটি যথাসময়ে চৌধুরী মহাশয়ের কানে গিয়া পৌছিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে কথাটি শুনিয়া তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। চীৎকার করিলেন না, গালি-গালাজ করিলেন না, শুধু একটু মুখ মচ্‌কাইয়া হাসিয়া কহিলেন,—তাই না কি? তা হলে তো রগড় বাধলো! যাই, ছোট ছেলেটা পূজোয় বাড়ী আসবে জানিয়েছে, একখানা চিঠি লিখে বারণ করে দি,—এবার যেন না আসে।

ক্রমে পূজার দিন নিকট হইয়া আসিল। যখন আর মাত্র পাঁচ ছয়দিন বাকি আছে তখন হঠাৎ একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটিল। বেশ্যাপল্লী হইতে আট দশ জন পেশাকারের একটি 'ডেপুটেশন' ঘোষবাবুদের সেজকর্তার সমীপে তাহাদের একটি বিনীত নিবেদন লইয়া হাজির হইল। দলটির পুরোভাগে ছিল ছিল বিশালকায়া বৃদ্ধা সোনামণি পেশাকার,—বেশ্যাপল্লীর সরকারী ঠানদি'। নিবেদনটি এই: পেশাকারদের সকলকে বিজয়ার দিন মণ্ডপে উঠিয়া প্রতিমা বরণের অধিকার দিতে হইবে। তাহারা বেশ্যা হইতে পারে, কিন্তু তাহারাও নারী, তাহারাও মহামায়ার সন্তান। সুতরাং গ্রামের সকল নারীর যে অধিকার আছে তাহাদেরই বা তাহা থাকিবে না কেন? তাহাদের জীবিকা অতি ঘৃণ্য, সমাজের চোখে তাহারা পতিতা। কিন্তু তাই বলিয়া জগজ্জননীর দরবারেও কি তাহারা পতিতা হইয়াই থাকিবে?

সোনামণি খুব বলিয়ে কইয়ে মানুষ; ডেপুটেশনের মুখপাত্র

হিসাবে নিজের বক্তব্যটি সে চমৎকারভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া পেশ করিল। বেশ একটু করুণ রসের অবতারণা করিয়া পরম বিনতির সহিত সে কথাগুলি বলিল বটে, কিন্তু সেজকর্তার মনে হইল যেন ভিতরে ভিতরে একটা দৃঢ়সঙ্কল্পের আভাসও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আরও মনে হইল, সোনামণি যেন কাহার শিখানো কথা আওড়াইতেছে। এই নেপথ্যবিহারী লোকটি যে কে তাহা বুঝিতেও তাঁহার বিশেষ বিলম্ব হইল না। মধু চৌধুরীই যে সকল নটের গুরু সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন। মনে মনে তিনি খুবই চটিলেন, একটু শঙ্কিত হইয়াও উঠিলেন।

কিন্তু মনের ক্রোধ তিনি মুখে প্রকাশ করিলেন না। জমিদারি কবিয়া চুল পাকাইয়াছেন, হঠকারিতা জিনিসটা যে বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে সর্বথা পরিত্যাজ্য সেকথা তিনি ভালো করিয়াই জানিতেন। একটুখানি চিন্তা করিয়া বলিলেন,—তা কথাটা তোমরা নেহাৎ অন্যায্য কিছু বলো নি। তা ছাড়া তোমরা পেশাকার পাড়ার লোকেরা আমার সাক্ষাৎ ভিটেবাড়ীর প্রজা। কাজেই তোমাদের সব আবদার শুনতে আমি ন্যায়তঃ ধর্মতঃ বাধ্য। কিন্তু কি জানো, সোনামণি, হাতী আজ পাঁকে পড়েছে। গাঁয়ের তিনঘর জমিদারের মধ্যে একদিন আমাদেরই বোলবোলাও ছিল সবচেয়ে বেশী। তখন ঘোষ বাবুরা যা করতেন গাঁয়ের সবাই তা মাথা পেতে মেনে নিত। কিন্তু এখন তো আর সে দিন নেই,— এখন আমাদের পড়ন্ত দশা। জানোই তো, দশজনে বলাবলি করে, হাটের তোলা তুলে নাকি আমরা সংসার চালাই। এমন অবস্থায় আমরা যদি হট্ করে একটা নতুন কিছু করে বসি, আত্মীয়-স্বজন বিরূপ হবে, মিত্তির বাবুরা দত্ত বাবুরা দাঁত বার করে হাসবে,— হয়তো বা সমাজেও ঠেলতে পারে। তাই—আমি বলি কি, তোমরা একবার মিত্তির বাড়ী আর দত্ত বাড়ী যাও ; তাদের যদি বুঝিয়ে

বুঝিয়ে রাজি করাতে পারো, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি, আমার মণ্ডপে ঢুকতে কেউ তোমাদের বাধা দেবে না।

বেশ্যার দল সন্তুষ্টচিত্তে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। বোড়ের চালে কিস্তি মাত করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া সেজকর্তা মনে মনে খুব খুসি হইয়া উঠিলেন।

মিত্তির বাড়ীতেও ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় কাটিয়া গেল। বুড়ো বাবুর সঙ্গে দেখা হইল না; তিনি হাঁপানির রোগী,—বড় একটা বাহিরে আসেন না। নাতিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, প্রতিমা মণ্ডপ হইতে বাহিরে নামানোর পর পেশাকারেরা স্বচ্ছন্দে আসিয়া বরণ করিতে পারে; তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু গুরু-পুরোহিত ও আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া তিনি তাহাদিগকে মণ্ডপে উঠিয়া বরণ করিবার অনুমতি দিতে পারেন না। তাহারা যেন পূজার মধ্যে পুনরায় একবার আসিয়া খোঁজ লইয়া যায়।

গোল বাধিল দত্ত বাড়ীতে। সোনামণির দল যখন দত্ত বাবুদের কাছারি বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল তখন সেখানে ছোট বাবু সিংহেশ্বর দত্ত মহাশয় ও সদর নায়েব শ্রীকান্ত সেন ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না। দত্ত বাড়ীর এই ছোট বাবুটি একটু গোঁয়ার গোবিন্দ ধরণের লোক ছিলেন। লেখাপড়া বিশেষ কিছু করেন নাই,—শিকার ও গানবাজনা লইয়াই থাকিতেন; জমিদারী চালবাজির বড় একটা ধার ধারিতেন না, যখন যাহা মনে হইত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই বলিয়া ফেলিতেন। সোনামণির মুখে পেশাকারদের প্রার্থনা শুনিয়া সিংহেশ্বর বাবু একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। চোখ লাল করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—কি! যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা! দত্ত বাড়ীর প্রতিমা বরণ করবে বাজারের বেউশ্যের দল! জুতিয়ে সব মুখ ভেঙে দেব, জান না? এত বড়ো আস্পর্ধা। দিন দিন হলো কি?—বুঝতে আমার কিছু

বাকি নেই, সব ঐ ম'ধো মাতালটার কারসাজি। পিঁপড়ের পাখনা গজিয়েছে,—না পাখি হয়ে আকাশে উড়বার সাধ হয়েছে ? যা—যা, তোদের বুড়ো বাবাকে বলগে' যা, পুজোর মধ্যে যদি কোন পেশাকার দত্ত বাড়ীর ত্রিসীমানা মাড়ায় তাহলে দারোয়ান দিয়ে ঠেঙিয়ে তার ঠ্যাং ভেঙে দেব। দেখি হারামজাদা বুড়ো কি করতে পারে!

পেশাকারের দল কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল।

সেই দিন দুপুরবেলা আবগারীর দোকানে আফিম কিনিতে গিয়া দত্ত পাড়ার মহেশ চাটুজ্জের সঙ্গে মধু চৌধুরীর দেখা হইয়া গেল। চৌধুরী মহাশয় তখন রঙে ছিলেন; চাটুজ্জেকে পাকড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—কি বাবা, মহেশ চন্দোর, তোমাদের পাড়ায় নাকি খুব সিঙ্গি গজরাচ্ছে শুনলাম। একটু বারণ করে দিয়ো বাবা, অত তড়পানি ভালো নয়। সিঙ্গিরও মামা আছে, তার নাম ভোম্বলদাস। এবার পূজোর বাজারে ধানসোনায় ভোম্বলদাসের খেল্ দেখবে সবাই। সিঙ্গি এবার কুপোকাৎ।—তাহার পর ফড়্ ফড়্ করিয়া কতকগুলা অশ্লীল ছড়া কাটিয়া চটিজুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে পেশাকার পাড়ার দিকে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চমীর দিন হঠাৎ গ্রামে খুব হৈ-চৈ পড়িয়া গেল; এমন একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল যাহা ইহার পূর্বে কখনো কোথাও ঘটিয়াছে বলিয়া কেহ শোনে নাই। দুর্গাপূজার উপচার সংগ্রহ একটা বৃহৎ ব্যাপার। পূজার সপ্তাহ খানেক পূর্ব হইতে পূজাবাড়ীর লোকজন ফর্দ হাতে করিয়া ছুটাছুটি সুরু করিয়া দেয়। এ দোকান ও দোকান এপাড়া ওপাড়া হাঁটাহাঁটি করিয়া তবে আয়োজন সম্পূর্ণ করা যায়,—অনেক সময় এই জন্য গ্রামান্তরেও পাড়ি দিতে হয়। চল্লিশ দফা মহাস্নান-দ্রব্যের অন্যতম হইতেছে বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা। এই বস্তুটির সন্ধানে দত্ত বাড়ীর লোক পেশাকার পাড়ায় ঢুকিয়াছিল, সোনামণি তাহাকে স্বহস্তে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে।

সংবাদটি যখন দত্তবাড়ী গিয়া পৌঁছিল তখন বাবুরা প্রমাদ গণিলেন। বুঝিতে পারিলেন, মধু চৌধুরী নীরবে লাঞ্ছনা হজম করিবার লোক নহেন ; তিনি অল্পে ছাড়িবেন না।

তথাপি আর একবার লোক পাঠানো হইল, যদি মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া সুঝাইয়া অথবা প্রয়োজন হইলে গায়ের জোরে কার্যোদ্ধার করা যায়। পাইক পেয়াদা লইয়া প্রায় আট দশ জন গেল। কিন্তু এবার গিয়া তাহারা যাহা দেখিল তাহাতে তাহাদের চক্ষুস্থির হইবার উপক্রম হইল। শাবল খোন্তা চেলাকাঠ ঝাঁটা বঁটি প্রভৃতি নানা মারাত্মক প্রহরণে সজ্জিতা পেশাকারের দল গাছকোমর বাঁধিয়া রণরঙ্গিনী মূর্তিতে তাহাদের পাড়ার প্রবেশপথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; চক্ষে প্রকাশ্য সংগ্রাম ঘোষণার তড়িৎ খেলিতেছে, মুখে অনর্গল গালির ঝড় বহিতেছে। বাজারের লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে, কেহ কেহ বা লাঠি শোঁটা লইয়া তাহাদের দলে ভিড়িয়া গিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই ভিন্‌দেশী লোক, স্থানীয় জমিদারদের বড় একটা তোয়াক্কা করে না। তাহার উপর অন্তরালচারী চৌধুরী মহাশয় আজ কল্পতরু হইয়াছেন, বিনামূল্যে সকলকে পানীয় বিতরণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং পেশাকার পাড়ার দুর্গরক্ষা করিবার নিমিত্ত পুরুষ যোদ্ধারও অভাব হয় নাই। দত্ত বাবুদের প্রেরিত লোকজন বেগতিক দেখিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।

অন্যান্য পূজাবাড়ী হইতে যাহারা উপচার সংগ্রহের জন্য বেশ্যাপল্লীতে গিয়াছিল তাহাদিগকে কেহ কোন বাধা দেয় নাই। লাঞ্ছিতা পতিতাদের সমস্ত ক্রোধ একমাত্র দত্ত বাবুদের বিরুদ্ধেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। ভগ্নদূতের মুখে রণক্ষেত্রের সমাচার পাইয়া দত্ত বাড়ীর সকলেই খুব উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এখন উপায় !

সিংহেশ্বর বাবু অবশ্য প্রথমটা খুব লম্ফ-ঝম্ফ করিয়াছিলেন, আস্ফালন করিয়া বলিয়াছিলেন, পেশাকার পাড়ায় আগুন লাগাইয়া

দিবেন, লাঠিয়াল দিয়া লুঠ করাইবেন। শ্রীকান্ত বাবু তাঁহাকে শান্ত করিলেন; বলিলেন যে একেই ব্যাপারটা গ্রাম-জানাজানি হইয়া গিয়াছে, লোক হাসিতে শুরু করিয়াছে,—ইহার উপর যদি একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় তাহা হইলে আর লজ্জার অবধি থাকিবে না, সমস্ত মান-মর্যাদা ধুলায় লুটাইবে। আর মধু চৌধুরীও তো তাহাই চায়, যেন তেন প্রকারেণ দত্ত বাবুদের উঁচু মাথা হেঁট করিয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। সুতরাং বৃথা উত্তেজনায় কালক্ষেপ না করিয়া একটা উপায় ভাবিয়া বাহির করা প্রয়োজন।

কিন্তু কি উপায় করা যায়? শতাধিক বৎসরের পুরাতন পূজা। উপচারের অভাবে তাহার অঙ্গহানি হইবে এমন কথা চিন্তাও করা যায় না। এদিকে নিকটে আর কোথাও বেশ্যাপল্লী নাই। বাণিজ্য কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোথাও বেশ্যার বসতি বড় একটা দেখা যায় না, —অন্ততঃ মধ্যবঙ্গের এই সব পল্লী অঞ্চলে দেখা যায় না। এ মুল্লুকের একমাত্র গঞ্জ এই ধানসোনা। আশেপাশের সমস্ত গ্রাম হইতে পূজার এই উপচারটি সংগ্রহ করিতে লোক ধানসোনার পেশাকার পাড়াতেই আসে। দত্ত বাবুরা তাহা হইলে কোথায় যাইবেন? মহকুমা সহরে লোক পাঠাইবার সময় আর নাই; সে লোক ফিরিয়া আসিতে আসিতে সপ্তমী পূজার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। সেদিন রাত্রে দত্ত বাড়ীর কর্তাদের কাহারও ভালো করিয়া ঘুম হইল না।

পেশাকার পাড়ায়ও কেহ ঘুমাইল না। তাহারা দল বাঁধিয়া পালা করিয়া পাড়া পাহারা দিল; তাহাদের বাজার-নিবাসী পৃষ্ঠ-পোষকের মদ গাঁজা খাইয়া সারারাত্রি হল্লা করিয়া কাটাইল। আর সকলের পিছনে বসিয়া সমাজ-বিপ্লবের আগুনে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন মধু চৌধুরী মহাশয়। লাঠিয়াল লইয়া আক্রমণ বা অন্যপ্রকার বলপ্রয়োগের সম্ভাবনার বিরুদ্ধেও প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। ঘোষ বাবুদের সহিত দত্ত বাবুদের তিন পুরুষের

বিরোধ ; সুযোগ বুঝিয়া সেজকর্তা রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, তাঁহার প্রজাদের ভিটা যদি আক্রান্ত হয় তাহা হইলে তিনি তাহা চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে পারিবেন না। তাঁহার হাতেও লাঠিয়াল আছে। সমস্ত গ্রাম জুড়িয়া উত্তেজনার বান ডাকিয়া গেল। এই অভূতপূর্ব দ্বন্দের ফলাফলের জন্য সকলে উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল ; সর্বত্রই একটা কি-হয় কি-হয় ভাব।

পরদিন প্রভাতে এদিকে বোধনের বাজনা বাজিয়া উঠিল, ওদিকে দত্তবাড়ী হইতে একজন আমলা ঘোড়ায় চড়িয়া পরাক্রমপুর থানা অভিমুখে রওনা হইয়া গেল পুলিশে খবর দিতে। তাহার পর শ্রীকান্ত বাবু নিজে একাকী পেশাকার পাড়ায় গেলেন একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে। সেখানে গিয়া তিনি ব্যূহরক্ষা ও রণসজ্জার যে বিরাট আয়োজন দেখিলেন তাহাতে দস্তুরমত ভড়কাইয়া গেলেন। তথাপি একবার সোনামণিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, মুখোমুখি কথা বলিয়া যদি কোন সুরাহা করা যায়। কিন্তু সোনামণি আসিল একেবারে যুদ্ধং দেহি ভাব লইয়া। কোন কথা শুনিবার আগেই সে তাহার চরম প্রস্তাব জানাইয়া দিল,—পাড়ার সকল পেশাকারকে মণ্ডপে উঠিয়া প্রতিমা বরণ করিতে দিতে হইবে এবং চৌধুরী মহাশয়কে সসম্মানে পূজার নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। এই দুইটি সর্ত গ্রহণ করিতে বাবুরা যদি রাজি না হন, তাহা হইলে পেশাকার পাড়ার প্রত্যেকটি নারী বরং প্রাণ বিসজন দিবে তথাপি দত্ত বাড়ীর কাহাকেও সূচ্যগ্র পরিমাণ মৃত্তিকা লইতে দিবে না। শ্রীকান্ত বাবু হতবাক্ হইয়া রহিলেন। পিছন হইতে চৌধুরী মহাশয়ের চড়া গলার চীৎকার শুনা গেল,—এত খোঁজাখুঁজির দরকার কি নায়েব মশাই ? নিজের বাড়ীর দরজার মাটি খানিকটা খুঁড়ে নিলেই তো পারেন।

শ্রীকান্ত বাবুর স্ত্রীর চরিত্র লইয়া গ্রামের লোক কানাঘুষা করিত ; কাজেই ইঙ্গিতটা প্রায় কাহারও বুদ্ধির অগম্য রহিল না।

চারিদিকে একটা চাপা হাসির গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। অপমানিত শ্রীকান্ত বাবু পলাইতে পথ পাইলেন না।

এদিকে থানা হইতে আমলাটি যে সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল তাহাও বিশেষ সুবিধার নহে। দারোগাবাবু একে নূতন বদ্‌লি হইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে মুসলমান। ব্যাপারটির গুরুত্ব তিনি মোটেই অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। তাঁহার মতে নিজের গৃহে অপর লোককে প্রবেশ না করিতে দিবার অধিকার সকলেরই আছে, পেশাকারদেরও আছে। আইনে ইহাই বলে। তবে দত্ত বাবুদের লোককে সোনামণি ঝাঁটা মারিয়াছে ; সেজন্য বাবুরা ইচ্ছা করিলে ফৌজদারি মামলা আনিতে পারেন। অবশ্য অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে সোনামণিরও পাল্‌টা মামলা রুজু করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। এক্ষেত্রে দারোগা বাবুর করিবার কিছুই নাই। নেহাৎ যদি বাবুরা পীড়াপীড়ি করেন, তাহা হইলে তিনি পুলিশ লইয়া আসিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। কারণ জোর করিয়া পেশাকার পাড়ায় প্রবেশ করিতে তিনি কাহাকেও সাহায্য করিতে পারিবেন না। বরং কেহ যদি তাহা করিতে চায়, তাহাকে তিনি বাধা দিবেন, প্রয়োজন হইলে গ্রেপ্তার করিবেন। বুঝা গেল, চৌধুরী মহাশয় বৃথাই সারাজীবন পেশকারি করেন নাই, আইন কানুনের খবর তিনি ভালো করিয়াই রাখেন।

দত্ত বাড়ীতে নৈরাশ্যের ছায়া পড়িল। রাত পোহাইলে সপ্তমী পূজা আরম্ভ হইবে ; বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা না হইলে উপচার সম্পূর্ণ হইবে না, পূজার অঙ্গহানি হইবে। এক উপায় আছে, অন্যান্য পূজাবাড়ী হইতে তাহাদের সংগৃহীত মৃত্তিকার কিছু কিছু অংশ ভিক্ষা করিয়া উপচার সংগ্রহ করা। কিন্তু তাহাও তো কম মর্যাদাহানিকর নহে। উপরন্তু গ্রামবাসীদের অধিকাংশই সত্য খবর পাইবে না ; তাহারা ভাবিবে বেশ্যারাই জিতিয়া গেল, দত্তবাড়ীর পূজায় খুঁত রহিয়া গেল।

বাবুদের সহিত শ্রীকান্ত সেন মহাশয় বহুক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলেন, এবং তাহার পর শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ীতে আসিলেন তাঁহার মতামত জানিবার জন্য। শিরোমণি মহাশয় সমস্ত খবরই রাখিতেন, একটু ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিলেন,—আপনাদের জমিদারি মেজাজের মশাই অন্ত পাওয়া ভার। সব কিছুতেই জবরদস্তি, সব কিছুতেই বিক্রম ফলানো! কেলেঙ্কারিটি বেশ ভালো করে বাধিয়ে তুলে এখন ছুটে এসেছেন শিরোমণির কাছে,—কি না শিরোমণি ফন্দি বাতলে দেবে! আরে মশাই, ঠাকুর দেবতা নিয়ে কাণ্ড, এর মধ্যে কি ফন্দি ফিকির চলে? করছেন মহামায়ার পূজো, অথচ অহঙ্কারটি বজায় রেখেছেন ষোল আনা!—আমার পূজো! আমার প্রতিমা! আমার মণ্ডপ! পূজোর ক'টা দিন যে জমিদারের মণ্ডপ আর জমিদারের থাকে না, মায়ের মন্দির হয়ে যায়, তাও বুঝবার মতো বুদ্ধি নেই ঘটে,—অথচ পূজোটি করা চাই! মায়ের মন্দিরে মায়ের সন্তান ঢুকবে, তার আবার ছোটবড়ো বাছবিচার কিসের বলুন তো নায়েব মশাই?—যান, আমার পরামর্শ দেবার কিছুই নেই; আপনাদের সিংহেশ্বর বাবু যা বলেন তাই করুন গিয়ে।

সন্ধ্যার পূর্বেই সন্ধি ঘোষিত হইয়া গেল। পেশাকারদের দুইটি দাবীই দত্ত বাবুরা মানিয়া লইলেন এবং বিনিময়ে উপচার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেশ্যাপল্লীতে প্রবেশাধিকার পাইলেন। দত্ত বাবুদের মর্যাদা রক্ষার জন্য মিত্তির বাড়ী ও ঘোষ বাড়ী হইতে জানাইয়া দেওয়া হইল যে তাহারাও পেশাকারদিগকে অনুরূপ অধিকার প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন।

সেদিন সারারাত ধরিয়া পেশাকার পাড়ায় বিরাট মাইফেল চলিল। মদ খাইয়া নাচিয়া গাহিয়া হুল্লোড় করিয়া বেশ্যার দল তাহাদের বিজয়োল্লাস প্রকাশ করিল। পরদিন চৌধুরী মহাশয় একপেট মদ গিলিয়া গ্রাম ভ্রমণে বাহির হইলেন,—অসংযত ভাষণ, অশিষ্ট আচরণ ও সম্ভ্রমহীনতার চরম করিয়া ছাড়িলেন। যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই ডাকিয়া খুব খানিকটা খেঁউড় খিস্তি

শুনাইয়া দিলেন এবং অনর্গল অশ্রাব্য ভাষায় ছড়া কাটিতে লাগিলেন।

পূজার তিনটি দিনই তিনি এইরূপ করিয়া কাটাইলেন। তাহার পর বিজয়ার দিন অপরাহ্নে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া মিত্তির পাড়ার পথের উপর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। পাড়ার ছেলেরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেল। শ্রীধর কবিরাজ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে রায় দিলেন যে অবস্থা খুবই শঙ্কটজনক,—জীবনের আশা এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। তখনই চৌধুরী মহাশয়ের তিন ছেলের নিকট টেলিগ্রামে সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইল, এবং এদিকে যথাসম্ভব চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করা হইল। তিন দিনের দিন মেজ ছেলে ও ছোট ছেলে দেশে আসিয়া পৌঁছিল। বড় ছেলে আসিতে পারিল না; সে বহুদূরে ব্যাঙ্গালোরে চাকুরি করিত, তাহার উপর নিজেও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার সহিত ঘন ঘন টেলিগ্রামে বার্তা আদান প্রদান চলিতে লাগিল।

পাঁচদিন অচৈতন্য হইয়া থাকিবার পর চৌধুরী মহাশয়ের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সকলেই বুঝিল প্রদীপ নিভিবার পূর্বে শেষবারের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সেজছেলে চন্দ্রনাথ শিয়রে বসিয়াছিল, বাপের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বাবা, কিছু খেতে টেতে ইচ্ছে করে?

অত্যন্ত সহজ ভাবে হাসিয়া চৌধুরী মহাশয় উত্তর দিলেন,—আর কেন বাবা? বহুৎ খেয়েছি, সারাজীবন খেয়েছি। পোলাও-কালিয়া মোণ্ডা-মিঠাই দুধ-ঘি ছ্যানা-ননী—সব খেয়েছি। এখন শুধু গোটা দুই খাবি খেতে বাকি আছে। আর কিছু খাবার সখ নেই।

ভগ্নী একটি তামার কুশীতে করিয়া গঙ্গাজল লইয়া আসিয়া মুখে দিতে গেলেন। চৌধুরী মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন,—ও কি?

—গঙ্গাজল? মা গঙ্গা মাথায় থাকুন! ও আর মুখে দিস্ নে, সাবি! মাথায় ছিটিয়ে দে! আর মুখে যদি নেহাৎই কিছু দিতে চাস্ তো একটু লাল জল বরং যোগাড় করে নিয়ে আয়।

ইহার আধঘণ্টা পরেই তিনি পুনরায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। আর জ্ঞান ফিরিল না। স্পষ্টবক্তা মধু চৌধুরীর কণ্ঠ চিরদিনের জন্য নীরব হইয়া গেল।

বাহির বাড়ীতে পেশাকার পাড়া হইতে বেশ্যার দল আসিয়া বসিয়া ছিল। তাহারা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

১২

ছোট গ্রাম, ছোট ছোট জীবন,—তাহার মধ্যে ছোট ছোট সুখ দুঃখের সংঘাত। কিন্তু ছোট বলিয়া মানিয়া লইলেই তো তাহারা তুচ্ছ হইয়া যায় না! জ্যামিতিতে পড়িয়াছি, একটি সমগ্র বস্তু উহার যে কোন অংশ হইতে বৃহত্তর। বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকেরা কি বলিবেন জানি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস, অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে এই সাধারণ স্বতঃসিদ্ধটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে; বরং ইহার বিপরীতটিই সত্য বলিয়া মনে হয়। মানব-জীবন বলিয়া যে সামগ্রিক সত্তাটির কথা আজকাল আমরা চিন্তা করিতে শিখিয়াছি, যে কোন একটি মানুষের জীবন তাহা হইতে ক্ষুদ্রতর তো নহেই, বরং বৈচিত্র্য ও অনুভূতিব তীব্রতার দিক হইতে বিচার করিলে অনেকাংশে বৃহত্তর। গাণিতিক পরিভাষা ব্যবহার করিয়া একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে, বহু মানবের বহু জীবনের গ-সা-গু মাত্র লইয়াই এই তথাকথিত মানব-জীবনের ধারণা আমরা গড়িয়া তুলিয়াছি। তাই আজ বিশ্বমানবের ইতিহাস সভ্যতা ও সংস্কৃতির রসে পরিপুষ্ট মন লইয়াও যখন পিছন দিকে ফিরিয়া চাই, তখন আমার সেই ছোট্ট গ্রামখানির সামান্য নরনারীগুলিকে কিছুতেই ছোট বলিয়া ভাবিতে পারি না। স্মৃতির কাননে কোথায় একটি ক্ষুদ্র বনফুল ফুটিয়াছে, তাহার সৌরভে সমস্ত মন আমোদিত হইয়া উঠে। তোতা পাখির মত শিখানো বুলি কপ্‌চাইয়া তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে ভাবের ঘরে চুরি করা হয় মাত্র,—সত্য সত্যই তাহা তুচ্ছ হইয়া যায় না।

রবিবারের সকাল। ঘরের মধ্যে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি একবার আনন্দ মণ্ডলের বাড়ী যাইব কি না, এমন সময় বাহির হইতে

মা ডাকিয়া কহিলেন,—ওরে যাত্ন, শ্যামচাঁদ এসেছে ; একডালা পান সুপুরি সাজিয়ে নিয়ে আয়।

একটা ডালায় করিয়া গুটিদশেক আস্ত পান, এক দলা চুন, উপযুক্ত পরিমাণ খয়ের, চারটি গোটা সুপারি ও একপাতা আলো তামাক লইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম শ্যামচাঁদ বৈরাগী ও তাহার তুই বৈষ্ণবী দাওয়ার নীচে কম্বল বিছাইয়া বসিয়া গিয়াছে। কম্বলখানি তাহারা সঙ্গে করিয়াই লইয়া আসিয়াছিল। বামুন বাড়ীতে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতে আসিয়া আসন চাহিলে নাকি বামুনের মর্যাদাহানি করা হয়। এদিকে বিনা আসনে উপবেশন করিতে শ্যামচাঁদের নিজের মর্যাদায় বাধে। পরস্পর-বিরোধী এই দ্বিবিধ মর্যাদার মধ্যে আপোসে একটা সঙ্গতি বিধান করিবার উদ্দেশ্যে শ্যামচাঁদ নিজের আসন নিজেই বহন করিয়া আনিত।

পাড়ায় শ্যামচাঁদের গানের বহু ভক্ত ছিল। আমার ছোট বোন দৌড়িয়া গিয়া গাঙ্গুলি পিসী ও হাবু স্যাকরার বৌকে ডাকিয়া আনিল ; আনন্দ মণ্ডল নিজ হইতে আসিয়া একটু বাহিরের দিকে সদর দরজার কাছে দাওয়া ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল ; ছেলেমেয়ের দল আসিয়া উঠানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। তামাকপাতা সহযোগে একদফা তাম্বুলচর্চার পর গান শুরু হইল। শ্যামচাঁদের নিজের হাতে একতারা ; বৈষ্ণবীদ্বয়ের একজন বাজাইতেছে মন্দিরা, অপরজন বাজাইতেছে ডুগী,—ডুগী তবলা নহে, মাত্র একটি ডুগী। শ্যামচাঁদের নিজের কণ্ঠে ভরাটি গম্ভীর সুর ; বৈষ্ণবীদের একজনের গলা নরম ও মিঠা, অপরার তীব্র স্বর চড়া পর্দায় বাঁধা। উদারা মুদারা ও তারা-র সংমিশ্রণ হইতে উদ্ভূত এরূপ অপূর্ব স্বর-সঙ্গতি প্রাচ্য সঙ্গীতে আর কুত্রাপি শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। একতারার তারে ঝঙ্কার তুলিয়া শ্যামচাঁদ গান ধরিল,—

হরি, তোমায় ডাকবো আমার সময় কই ?
আমার সে প্রেমো কই ?—

আলাপের ঢঙে এই দুই লাইন সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বারকয়েক একা গাহিল; তাহার পর সমের মাথায় ডুগীতে ঘা পড়িল,—বৈষ্ণবীরা তাহার সুরে সুরে মিলাইয়া গাহিতে শুরু করিল।

গানের পর গান চলিতে লাগিল। এবাড়ী ওবাড়ী হইতে আরও কয়েকজন নরনারী আসিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যাবৃদ্ধি করিল। গানের ফাঁকে ফাঁকে পান সাজা ও খাওয়া চলিতে লাগিল; টুকরা টাকরা আলাপ আলোচনার অবতারণাও হইতে লাগিল; মধ্যে একবার শ্যামচাঁদ তাহার ঝুলি হইতে ছোট একটি হুঁকা বাহির করিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দুই এক টান টানিয়া লইল। গান যখন শেষ হইল তখন বেলা প্রায় দেড় প্রহর হইয়া গিয়াছে। তাহার পর সেরটাকখানেক চাল, কিছু তরিতরকারি ও দুই আনা পয়সার সিধা ঝুলির মধ্যে ঢালিয়া লইয়া শ্যামচাঁদ সদলবলে প্রস্থান করিল। আমরা বলিতাম সিধা, কিন্তু শ্যামচাঁদ নিজে ভিক্ষাই বলিত।

শ্যামচাঁদ বৈরাগী সম্পন্ন গৃহস্থ। ঘোষপাড়া হইতে যে পথটি সোজা দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়া জেলাবোর্ডের বড় রাস্তার সহিত মিশিয়াছে তাহার বামদিকে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর সযত্ন-সজ্জিত বাগান ও বাগিচার মধ্যে শ্যামচাঁদের বাড়ী। সদর রাস্তা হইতে বাহিরের ঘর পর্যন্ত দুই সারি সুবিন্যস্ত সুপারি গাছ, তাহাব মধ্যে মধ্যে কামিনী বেল জুঁই ও হাস্নুহানা ফুলের ঝোপ; সমস্ত বাড়ীটি জুড়িয়া এমন একটা স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্নতার ভাব যে দেখিলেই একবার বাঃ! বলিতে ইচ্ছা করে।

শ্যামচাঁদের বাগানের লিচু গোলাপজাম ও জামরুল গাছের কথা জীবনে ভুলিতে পারিব না,—এমন মিষ্ট ফল গ্রামের আর কোথাও মিলিত না। এই সব গাছের ফল যখন পাকিত তখন গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা লুব্ধ চাঞ্চল্যের সাড়া

পড়িয়া যাইত। মাঝে মাঝে দুপুর বেলায় নির্জনতার সুযোগ লইয়া আমরা গিয়া বাগান আক্রমণ করিতাম। শ্যামচাঁদ বাড়ীতে থাকিলে হাসিতে হাসিতে লাঠি হাতে ছুটিয়া আসিত; আমরাও হাসিতে হাসিতে পলাইয়া যাইতাম। কিন্তু আমাদের আক্রমণ ও তাহার প্রতি-আক্রমণের মধ্যে প্রতিদিনই বেশ একটু অবকাশ থাকিত। ফলে পলায়নের সময় আমরা কোঁচড় ভর্তি করিয়াই পলাইতে পারিতাম। আর শ্যামচাঁদ বাড়ীতে না থাকিলে তো কথাই নাই। বৈষ্ণবীরা শুধু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিত, হাসিত আর গালি পাড়িত। আমরা মনের সাধ মিটাইয়া বৃক্ষলুণ্ঠন কার্য সমাধা করিতাম। গালি গালাজ গায়ে মাখিতাম না,—যেমন করিয়া হউক বুঝিতে পারিতাম, এ গালি শুধু শব্দের আড়ম্বর মাত্র, ইহার মধ্যে সত্যকার ক্রোধের বিষ নাই।

শ্যামচাঁদের বাগানে আর একটি ফলের গাছ ছিল, তাহাকে আমরা বিলাতি গাব বলিতাম। বড় হইয়া জানিয়াছি, তাহার নাম ম্যাঙ্গোষ্টীন,—আদি নিবাস মালয় দ্বীপপুঞ্জ। ধানসোনায় এ গাছ কেমন করিয়া আসিল তাহা আমরা কেহই জানিতাম না; শ্যামচাঁদ নিজেও জানিত না। গাছটিতে যখন ফল ফলিত তখন এত প্রচুর পরিমাণে ফলিত যে দেখিয়া মনে হইত বুঝি যত পাতা তত ফল! কিন্তু হায়! সে ফল আমাদের নাগালের বাহিরে ছিল। প্রকাণ্ড গাছ, তাহার সুদীর্ঘ সরল শাখা-প্রশাখাহীন কাণ্ড বাহিয়া আরোহণ করা আমাদের সাধ্যের অতীত ছিল। অবশ্য ফল পাকিলে শ্যামচাঁদ সেগুলিকে সযত্নে পাড়াইত এবং গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েদের ডাকিয়া প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া দিত। ফলটি খাইতে কি ভালোই যে লাগিত! এখনো ভাবিলে জিহ্বা রসার্দ্র হইয়া উঠে। একটা খাইয়া আশ মিটিত না, কিন্তু বেশ জানিতাম, আর একটা পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

শ্যামচাঁদ বৈরাগী সত্যই লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ; তাহার সংসারে কোন

অভাব ছিল না। পনের কুড়ি বিঘা খানী জমি ছিল, তাহা ছাড়া বাজারে ছোট একখানি তামাক ও বেনেতি মশলার দোকান ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিছু অর্থও তাহার হাতে ছিল। সত্য কথা বলিতে কি, গ্রামের অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ অপেক্ষা তাহার অবস্থা ঢের ভালো ছিল। কিন্তু তথাপি শ্যামচাঁদ প্রতি রবিবার সকালে বৈষ্ণবীদের সঙ্গে লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইত। আজ ভাবিলে অবাক হইয়া যাই,—কেন সে ভিক্ষা করিত? আধুনিক শহুরে অর্থনৈতিক মন লইয়া বিচার করিলে তাহাকে মূর্খ অথবা উন্মাদ ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া মনে হয় না। শ্যামচাঁদের উত্তরটি কিন্তু ছিল অত্যন্ত সহজ। জাতবৈষ্ণবের ছেলে সে। বৈষ্ণবের বৃত্তি ভিক্ষা। গৌরসুন্দর তাহার উপর সদয় হইয়াছেন, তাই আজ সে দুই পয়সার মুখ দেখিতেছে। কিন্তু সে যদি তাহার বৃত্তি পরিত্যাগ করে, ভিক্ষাকার্যকে হীন বলিয়া ঘৃণা করিতে শেখে, তাহা হইলে সে ধর্মে পতিত হইবে; গৌরসুন্দর বিরূপ হইবেন, তাহার সুখের সংসার উড়িয়া পুড়িয়া যাইবে। তখন তাহার হয়তো ভিক্ষান্নও জুটিবে না। শ্যামচাঁদ সত্যই ইহা বিশ্বাস করিত। আমাদের সমালোচনা ও বিশ্লেষণ তাহাকে আজ স্পর্শও করিতে পারিবে না। সুতরাং সেই ব্যর্থ পরিশ্রম হইতে বিরত থাকাই ভালো।

কিন্তু আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের মধ্যে খানিকটা আত্মমর্যাদা জ্ঞানেরও যে উদ্ভব হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই। সুতরাং সে মনের সহিত একটা রফা করিয়া ফেলিয়াছিল। সাধারণ বৈষ্ণবদের ন্যায়—জয় রাধে কৃষ্ণ!—বলিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া সে বেড়াইত না। সে ভিক্ষা করিত সপ্তাহে একদিন,—মাত্র একটি বাড়ীতে। তাহাও আবার ব্রাহ্মণের বাড়ী হওয়া চাই। তাহা ছাড়া সিধা বা ভিক্ষা হিসাবে সে যাহা পাইত দুই ঘণ্টা ধরিয়া সুমধুর সঙ্গীতরস বিতরণ করিয়া

সে তাহার মূল্য পরিশোধের চেষ্টা করিত। এইরূপে সে বৈষ্ণব-জনোচিত বৃত্তি ও গৃহস্থজনোচিত আত্মসম্মান—দুই কূলই বজায় রাখিয়া চলিত।

এই গৃহস্থ-বৈষ্ণব সম্প্রদায়টি আজকাল বাংলার পল্লীসমাজ হইতে প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। দাস পদবী গ্রহণ করিয়া ইহাদের অধিকাংশই নবশাখ সম্প্রদায়ের সহিত বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে; ভিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ বা কৃষিজীবীদের পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছে। আর অল্প দুই একজন যাহারা দৈবক্রমে ধনশালী হইয়া উঠিয়াছে তাহারা পাড়াগাঁয়ের বাস তুলিয়া দিয়া শহরে চলিয়া গিয়াছে, লেখাপড়া শিখিয়াছে, এবং পদবীর 'স'-কে 'শ'-য় রূপান্তরিত করিয়া কায়স্থ-বৈদ্যের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ভদ্রলোক সাজিয়া বসিয়াছে। কিন্তু আমি যখনকার কথা বলিতেছি তখনো তাহারা নিজেদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিত। এই স্বাতন্ত্র্য বেশ একটু উগ্র ধরণের ছিল; সাধারণ সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাস করা সত্ত্বেও ইহাদের আচার-ব্যবহারের মধ্যে বেশ একটু অসাধারণত্ব ছিল। ব্রাহ্মণ-শাসিত পল্লীসমাজের অঙ্গীভূত হইয়াও ইহারা ব্রাহ্মণের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে একরূপ উপেক্ষা করিয়াই চলিত। হিন্দুধর্মানুমোদিত দশবিধ সংস্কারের অনুষ্ঠান ইহারা করিত না; প্রচলিত পূজা-পার্বণের ধারও বড় একটা ধারিত না। দেবদেবীর মধ্যে তাহাদের উপাস্য ছিল একমাত্র রাধিকা-সংযুক্ত দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণ-মূর্তি ও গৌর-নিতাই। পূজার্চনাদি হয় তাহারা নিজেরাই করিত আর না হয়তো স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত গুরু-গোঁসাইদের দিয়া করাইত। বৈষ্ণবেতর কাহাকেও তাহারা পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিত না, নমস্কার করিয়াই কাজ সারিত। অন্যান্য সম্প্রদায় সাধারণতঃ যে সকল দেবদেবীর উপাসনা করিত তাহাদের সম্বন্ধে

এই বৈষ্ণবদের মনে একটা নিদারুণ অবজ্ঞার ভাব ছিল। এই অবজ্ঞা তাহারা গোপন করিবার চেষ্টাও বিশেষ করিত না। শালগ্রাম শিলাকে তাহারা 'পাথরের নুড়ি' বলিয়াই উল্লেখ করিত। কিন্তু সেজন্য গ্রামের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের সহিত তাহাদের কোনদিন লাঠালাঠি হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। তাহাদের এই বিশিষ্ট বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গিটিকে গ্রামের লোক সহজেই মানিয়া লইয়াছিল,—ব্যঙ্গবিদ্রূপ হয়তো কিছু কিছু করিয়াছে, কিন্তু প্রতিবাদ প্রতিরোধের চিন্তাও কোনদিন করে নাই।

শুধু ধর্মকর্মের দিক দিয়া নহে, সামাজিক আচাব-ব্যবহারের দিক দিয়াও ইহারা সাধারণ হিন্দু সমাজ হইতে একটু বিচ্ছিন্ন, একটু স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিত। যে সময়েব কথা বলিতেছি তখন হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রথা প্রায় অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই বৈষ্ণবদের মধ্যে তখনো এক পুরুষের একাধিক পত্নী গ্রহণই ছিল সাধারণ নিয়ম। তাই বলিয়া তৎকালীন বৈষ্ণবীদের নির্যাতিতা নারী বলিয়া ধরিয়া লইলে খুবই ভুল করা হইবে। বাল্যবিবাহের পাপ তখনো সাধাবণ হিন্দু সমাজ হইতে উন্মূলিত হয় নাই। ইহাদেব মধ্যে কিন্তু চিরকাল পূর্বরাগ-মূলক যৌবন-বিবাহের প্রথাই প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের মধ্যে যখন অষ্টমে গৌরীদানেব মহাপুণ্য ও রজস্বলা-সম্প্রদানের মহাপাতকের মধ্যে একটা মাঝামাঝি রফা করিবার চেষ্টা চলিতেছিল, ইহারা তখন পনের ষোল বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়াই সাধারণ নিয়মে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহা ছাড়া স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন হইলে সহজে বিবাহচ্ছেদের অধিকার ছিল, এবং বিবাহচ্ছেদের পর পুরুষের ন্যায় নারীও পুনরায় বিবাহ করিতে পারিত। বেশ বুঝা যায় একদা মুসলমানধর্মেব আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্যই হিন্দু সমাজে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়রূপ এই বহির্ব্যূহের উদ্ভব হইয়াছিল, যেমন পরবর্তীকালে খৃষ্টান-ধর্মপ্লাবন

প্রতিরোধের নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই জন্যই মুসলমানদের কয়েকটি সামাজিক প্রথা বৈষ্ণব সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এত পার্থক্য, এত স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও বৈষ্ণবদের হিন্দু বলিয়া মানিয়া লইতে কোন হিন্দু কোনদিন ইতস্ততঃ করিয়াছে এরূপ দেখি নাই। সকল প্রকার বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি গোপন ঐক্যের যোগসূত্র স্থাপন করাই হিন্দু সমাজ-সংস্থিতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য,—অন্ততঃ সেকালের গ্রামসমাজে তাহাই ছিল। মানুষে মানুষে সত্যকার বিভেদ সৃষ্টি হইল সেইদিন যেদিন বহু মানুষ একত্র ভিড় করিয়া শহরের উইঢিবিতে বাসা বাঁধিল,—গ্রামের সরস মৃত্তিকা হইতে জীবনতরুর মূল উপড়াইয়া আনিয়া তাহাকে টবের চারা করিয়া ফেলিল।

যাক্! এখন শ্যামচাঁদের কথায় ফিরিয়া আসা যাউক। পূর্বেই বলিয়াছি, শ্যামচাঁদের দুইটি বৈষ্ণবী ছিল। একজন শ্যামা, ঈষৎ স্থূলকায়া, গম্ভীর-প্রকৃতি ; অপর জন গৌরী, তন্বী, মুখরা ও চটুলা। তাহাদের সত্যকার নাম কি ছিল কেহই জানিত না ; শ্যামচাঁদ নিজে তাহাদের যথাক্রমে সত্যভামা ও রুক্মিণী বলিয়া ডাকিত। আধুনিক পাঠক-পাঠিকা হয়তো শুনিয়া একটু ক্ষুব্ধ হইবেন, একসঙ্গে দুই স্ত্রী লইয়া ঘর করা সত্ত্বেও শ্যামচাঁদের সংসার সুখের সংসার ছিল। সতীনে সতীনে ঝগড়া বিবাদ তো ছিলই না ; বরং পারস্পরিক শ্রমবিভাগের ফলে তাহারা গৃহস্থালীর মধ্যে এমন একটি লক্ষ্মীশ্রীর ভাব ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল যাহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। দুই বৈষ্ণবীর কাহারও কোন সন্তান হয় নাই। কাজেই শ্যামচাঁদের ব্যক্তিগত ও সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের প্রতি তাহারা অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারিত। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রেই তাহাদের মধ্যে একটু রেষারেষির ভাব বিদ্যমান ছিল। শ্যামচাঁদ ছিল আয়েষী ও আরাম-প্রিয়

স্বভাবের মানুষ। সুতরাং সে দুই বৈষ্ণবীর এই গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে উদ্ভূত সেবার বাড়াবাড়িটুকু বেশ ভালো করিয়াই উপভোগ করিত।

শ্যামচাঁদের সংসারে আর একটি মাত্র লোক ছিল। সে তাহার কিশোরী শ্যালিকা রাধা,—রুক্মিণী বৈষ্ণবীর ছোট বোন। বছর দুই আগে পিতামাতা দুইজনকেই হারাইয়া ভগ্নীপতির সংসারে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। এখন তাহার বয়স প্রায় সতের। এখনো বিবাহ হয় নাই, কিন্তু সমাজে সেজন্য কোন নিন্দার কথা ওঠে নাই,—কারণ সকলেই জানিত বৈষ্ণবদের ঘরে এরূপ প্রায়ই হইয়া থাকে। রাধা তাহার দিদির ন্যায় সুন্দরী নহে, তাহার গায়ের রঙটিকে বড়জোর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার মুখশ্রী বড় চমৎকার, বিশেষতঃ তাহার টানা টানা চোখ দুটির দিকে একবার চাহিলে সহজে দৃষ্টি ফিরানো যাইত না। রুক্মিণীর প্রগল্‌ভতা ও চাপল্যের লেশমাত্র তাহার মধ্যে ছিল না। সে ছিল অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের মেয়ে,—সাত চড়ে রা কাড়িত না, লোকের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিত না।

শ্যামচাঁদ তাহার এই ধীরা মিতভাষিনী শ্যালিকাটিকে বড় ভালোবাসিত। গ্রাম্য প্রথা অনুযায়ী তাহাদের সম্পর্ক ঠাট্টার সম্পর্ক। শ্যামচাঁদও শ্যালিকাকে লইয়া রসিকতা করিতে ছাড়িত না, বলিত,—রাধে, বলি ও রাধে, আর কতোদিন এমন করে কাটাবি? ঘরে তোর শ্যামচাঁদ বাঁধা রয়েছে,—আর তুই কার পথ চেয়ে দিন গুনছিস্ বল্ তো? ব্রজের শ্যামচাঁদ ষোল শ' গোপিনীর নাগর ছেলেন, ধানসোনার শ্যামচাঁদ কি তিন জনের মন জুগিয়ে চলতে পারবে না? মাথার চুল দু'একটা পেকেছে বটে, কিন্তু মনের ভেতরটায় চেয়ে দ্যাখ, সেখানে প্রেমের লহর খেলছে। কিশোরী-ভজনের বয়েস এখনো আমার যায় নি রে যায় নি!

রাধা কোন জবাব দিত না, শুধু একটু মুখ টিপিয়া হাসিত।

শ্যামচাঁদ তাহাকে একটি গাই গরু কিনিয়া দিয়াছিল ; তাহার সেবা ও পরিচর্যা লইয়াই সে দিন কাটাইত। গাইটির সম্প্রতি একটি বাছুর হইয়াছিল ; দুইবেলায় প্রায় চার সের দুধ দিত। এই দুধটুকু সে স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে যোগান দিত। যাহা পয়সা পাইত নিজেই লইত ; সামান্য সামান্য দুই একটি গ্রাম্য প্রসাধন-সামগ্রী বা দুই একখানি নক্‌সাপাড় রঙীন সাড়ী তাহা দিয়া কিনিয়া হয় নিজে ব্যবহার করিত, না হয়তো দিদি বা দিদির সতীনকে দিত। তিনটি প্রাণীর স্নেহচ্ছায়ায় পালিতা শ্যামা লতিকাটির মত রাধার জীবনের দিনগুলি নিশ্চিন্ত নির্ভরের প্রশান্তির মধ্যে কাটিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু এই রাধার জীবনেও একদিন এক চরম বিপর্যয়ের ঝড় উঠিল। সেদিন আর তাহার আপনজনের মুখ চাহিবার অবকাশ রহিল না ; বাঁধা পথের শেষে দাঁড়াইয়া সেদিন তাহাকে নিজেই নিজের জীবনের নূতন পথ বাছিয়া লইতে হইল। গ্রামপ্রান্তের এই শান্ত নির্ঝরিণীটিতে সহসা কেমন করিয়া কূলনাশিনী বন্যার প্লাবন জাগিল—সেই কাহিনী বর্ণনা করিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

রাধার একটু জ্বর হইয়াছিল, দিন পাঁচেক সে বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারে নাই। এ কয়দিন তাহার দিদিই যোগানের দুধটুকু দুই বেলা পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে। অন্নপথ্য করিবার পর প্রথম যেদিন সে পুনরায় সকালের দুধ লইয়া হেডমাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীর উঠানে গিয়া দাঁড়াইল সেদিন তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই, কারণ পল্লীগ্রামের ভাষায় 'সকাল' কথাটি বড়ই স্থিতিস্থাপক। ইহাকে যতই টানা যায় ততই ইহা বাড়িয়া চলে ; দুপুর গড়াইয়া যায় কিন্তু সকাল আর ফুরাইতে চাহে না।

—দুধ ন্যান, মা-ঠান !

বাড়ীটা কেমন নিঝুম মনে হইতেছে। হেডমাষ্টার মহাশয়

অবশ্য এ সময়ে এক রবিবার ছাড়া কোনদিনই বাড়ীতে থাকেন না, কিন্তু ছেলেমেয়েরাই বা গেল কোথায় ?

মা-ঠানের কোন সাড়া পাওয়া গেল না ; রাধার ডাক শুনিয়া রান্নাঘর হইতে একটি তরুণ যুবা হাতে একটা বড় জামবাটি লইয়া বাহির হইয়া আসিল। ইহাকে রাধা পূর্বে আর কখনও দেখে নাই। স্বভাবতঃ সে খুব মুখচোরা মেয়ে, কিন্তু হঠাৎ বিস্মিত হইয়া পড়ায় প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই পর পর দুইটা প্রশ্ন করিয়া বসিল।

—তুমি আবার কে গো ? মা-ঠান কোথায় গ্যালেন ?

—আমি ঠাকুর। মার শরীর খারাপ, তিনি দেশে গেছেন।

কয়েক মাস ধরিয়া হেডমাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ যাইতেছিল, রাধা তাহা জানিত। বিদেশী মানুষ, রুগ্ণা স্ত্রী ও তিনটি শিশু সন্তান লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু কবে তিনি তাহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন, ঠাকুরই বা কবে রাখিলেন, রাধা তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। সে তখন জ্বরে পড়িয়া ছিল, দিদিও তাহাকে কোন খবর দেয় নাই।

হাঁটু গাড়িয়া মাটিতে বসিয়া জামবাটিতে দুধ ঢালিতে ঢালিতে সে একবার চোখ তুলিয়া নূতন ঠাকুরটিকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। নেহাৎ ছেলে মানুষ! রাধার নিজের চেয়ে বড়জোর তিন চার বৎসর বেশী বয়স হইবে। মুখে এখনও একটা কচি কচি ভাব রহিয়াছে, ঠোঁটের উপর গোঁফের রেখা এখনও তেমন পুষ্ট হইয়া উঠে নাই। বয়সের তুলনায় দৈর্ঘ্য খুব বেশী নহে, সুস্থ সবল দেহ, কিন্তু কেমন নরম নরম ধরণের গড়ন। এদিকে কিন্তু বেশ সৌখীন মানুষ বলিয়া মনে হয়। মাথায় একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া বাব্‌রি চুল, পরণের ধুতিখানি দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শ্যামবর্ণ কাঁধের উপর ধব্‌ধবে শাদা পৈতাটি জিউলির আঠা দিয়া পরিপাটি করিয়া মাজা, ঠোঁট দু'খানি পানের রসে টুক্‌টুকে লাল। বেশ দেখিতে ছেলেটি, কেমন যেন গোপাল গোপাল চেহারা।

রাধা বেশীক্ষণ তাহার দিকে চাহিতে পারিল না, কারণ সে দেখিল ঠাকুরও তাহার দিকে চাহিয়া আছে,—একেবারে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া আছে। রাধার বয়স হইয়াছে। পুরুষ মানুষের চাহনির ইঙ্গিত সে ভালো করিয়াই বোঝে। এই তো, বাজারের বিড়িওয়ালা তারণ আচাজ্জি দু' বেলা তাহাদের বাড়ীর পাশ দিয়া আনাগোনা করে। তাহাকে দেখিতে পাইলেই হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, মনে হয় যেন চোখ দিয়া গিলিয়া খাইবে। কিন্তু সে চাওয়া আর এ চাওয়ায় অনেক তফাৎ। এ ছেলেটা যেন রাধাকে দেখিয়া একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে; চাহিয়া আছে যেন হাবার মতন, দেখিলে কেমন মায়া হয়।

দুই জনেরই কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি রাধা আড়ষ্ট ভাবে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া বসিয়া পায়ের নখ খুঁটিতেছে, ঠাকুর আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। মনে হইতেছে যেন কি একটা অস্পষ্ট আবিষ্কারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহারা দুই জনেই অকারণে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় আরও দু'একটা কথা বলিতে পারিলে ভালো হয়। কিন্তু কি কথা বলিবে? কেই বা বলিবে?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রাধা খালি দুধের কেঁড়েটার দিকে হাত বাড়াইল। ঠিক সেই সময় ঠাকুর প্রশ্ন করিল,—তোমার নাম কি?

—আমার নাম রাধা।

বোকার মত হাসিয়া ফেলিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠিল,—বাঃ! আমার নাম যে রাধাকান্ত। এ তো ভারী মজা দেখ্‌ছি!

রাগ করিবার একটা সুযোগ পাইয়া রাধা যেন বাঁচিয়া গেল। বড় বড় চোখ তুলিয়া একবার তীব্র ভৎর্সনার দৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে চাহিল, তাহার পর হেঁচকা টান দিয়া কেঁড়েটাকে কাঁখে তুলিয়া দুম্‌ দুম্‌ করিয়া বাহিরের দিকে চলিল।

বোকা ছেলেটা এই সময় একটা বেয়াড়া কাণ্ড করিয়া বসিল। ভাগ্যে বাড়ীতে আর কেহ ছিল না, লোকে দেখিলে কি যে ভাবিত! ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া আসিয়া দুই হাত মেলিয়া সে রাধার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। বলিল,—সত্যি বলছি ভাই, আমি ঠাট্টা করি নি। সত্যিই আমার নাম ঐ। তুমি আমার ওপর রাগ করো না। সত্যি আমি ঠাট্টা করিনি। মাইরি বলছি!

রাধার মনে হইল, ছেলেটার গলার সুর ভারী মিষ্টি—যেন বাঁশীর মত। সামান্য একটু ভুল হইয়াছিল তাহার। বাঁশী বাজিতেছিল সত্যই, কিন্তু রাধাকান্তের কণ্ঠে নহে, বাঁশী বাজিতেছিল রাধার নিজের মনের মধ্যে। এমন গোলমেলে মানসিক অবস্থা সে পূর্বে আর কখনো অনুভব করে নাই। কি করিবে কি বলিবে কিছুই সে ভাবিয়া পাইতেছিল না; লজ্জাও করিতেছিল খুব, অথচ এই লজ্জার মধ্যে কোথায় যেন একটা গোপন সুখের আভাসও পাওয়া যাইতেছিল।

রাধাকান্ত পাগলের মত বকিয়া যাইতেছিল,—ফস্ করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে কথাটা—সত্যি বলছি আমি কিচ্ছু ভেবে বলি নি—মা কালীর দিব্যি, আমি ঠাট্টা করি নি—সত্যিই আমার নাম ঐ। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো—আমার ওপর রাগ করো না—আমি আর কক্ষনো এমন কথা বলবো না।—তোমাদের গাঁয়ে আমি নতুন এসেছি—কেউ যদি শোনে—বাবু যদি শোনেন…

বাঁশী বাজিয়াই চলিয়াছে—সুর ক্রমশঃ যেন আরও মধুর, আরও করুণ হইয়া উঠিতেছে। রাধাকান্ত হেডমাষ্টার মহাশয়ের দেশের লোক। নদে জেলার মিঠে মিঠে টানের জন্য তাহার আবোল্-তাবোল কথাগুলি আরও যেন মিষ্ট শুনাইতেছে। রাধা বেহায়ার মত এক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, চোখে কেমন ঘোর-ঘোর লাগিতেছে, সর্বাঙ্গ অল্প অল্প টলিতেছে।

—বিশ্বাস করলে না আমার কথা? আচ্ছা এই আমি তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি গাল্‌ছি—

ক্ষ্যাপা ছেলেটা সহসা হেঁট হইয়া খপ্‌ করিয়া দুই হাত দিয়া রাধার পা দু'খানি চাপিয়া ধরিল।

রাধার সর্বশরীর প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়া হঠাৎ যেন কাঠ হইয়া গেল। বুকের ভিতর হইতে গলা পর্যন্ত কিসের একটা ঢেউ উঠিয়া ছলাৎ করিয়া ভাঙিয়া পড়িল। একবার মনে হইল ছুটিয়া পলায়, কিন্তু পা সরিল না, বোধ হয় মনও সরিল না। নিজের শরীরটাকে হঠাৎ বড় ভারী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সতের বৎসরের অবহেলিত যৌবন সহসা জাগিয়া উঠিয়া বালিকা বয়সের সমস্ত চাঞ্চল্যকে মুহূর্তের মধ্যে মুছিয়া নিঃশেষ করিয়া দিল। রাধা শক্ত করিয়া চোখ বুজিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক তরল তিরস্কারের সুরে বলিল, —ছিঃ! ও কি হচ্ছে?

তাহার পর হেঁট হইয়া রাধাকান্তের হাত ধরিয়া তুলিল; বলিল,— এ কি পাগলামি করছো বলো তো। বামুনের ছেলে, খপ্‌ করে আমার পায়ে হাত দিয়ে বসলে! কি এমন অন্যায় কথাডা তুমি বলেছো যে তার জন্যি পা ছুঁয়ে দিব্যি না করলি আর চলছিল না? নাও, ওঠো! দুধের বাটিটা তোলো, নিজের কাজ করো গিয়ে, যাও!—আমার কি আর কোন কাজ নেই? সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার পাগলামি শুন্‌লিই চলবে?

চিরকালের বোবা মেয়ে হঠাৎ আজ মুখরা হইয়া উঠিয়াছে। রাধাকান্ত অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিল, রাধার মুখে হাসি, চোখে জল।

রাধা শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। রাধাকান্ত সেইখানেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যতদূর দেখা যায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সমস্ত ব্যাপারটি ঘটিতে মিনিট পনের কুড়ির বেশী সময় লাগে

নাই। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই রাধার চক্ষুর সম্মুখে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রঙ বদলাইয়া গেল। ঘরের পথে ফিরিতে ফিরিতে তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন এইমাত্র স্নান করিয়া শুচি হইয়া আসিয়াছে, এখনই তাহাকে ঠাকুর পূজার আয়োজন করিতে হইবে। তাহার মনও যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছে,—এতকাল ধরিয়া মনের চারিদিকে যে আবছায়া কুয়াশার মালিন্যটুকু জড়াইয়া ছিল, সব যেন ধুইয়া মুছিয়া নির্মল হইয়া গিয়াছে। অকারণেই চোখের পাতা বার বার ভারী হইয়া উঠিতেছে, বার বার আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে হইতেছে।

কিন্তু তখনও রাধা পুরাপুরি বুঝিতে পারে নাই তাহার কি হইয়াছে। আনন্দ-বেদনার যে অপরূপ রসে তাহার হৃদয় সহসা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তাহার প্রকৃত স্বরূপটি সে তখনও যেন বুঝি বুঝি করিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু বুঝিতে তাহার বেশী দেরী হইল না।

সেইদিনই দুপুর বেলা। শ্যামচাঁদ দোকানে গিয়াছে। রাধা তাহার ছোট বিছানাটিতে চুপ করিয়া শুইয়া আছে। গ্রীষ্মকালের দুপুরে দিবানিদ্রার অভ্যাস তাহার আছে, কিন্তু আজ তাহার চক্ষে ঘুম নাই। একটা সুমধুর উত্তেজনায় তখনও তাহার সমস্ত মস্তিষ্ক ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। চিন্তার জটিলতা বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু অনুভূতির রাজ্যে কি একটা প্রবল আলোড়ন চলিতেছে।—পাশের ঘরে দিদি ঘুমাইতেছে। সত্যভামা ভিতরের বারান্দায় বসিয়া একতারাটা লইয়া পিড়িং পিড়িং করিতেছে।—ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা নাম বার বার মনে আসিতেছে, একখানি মুখ চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে; ভারী মিষ্টি মুখখানি। নামটিও বড় মধুর। রাধা চোখ বুজিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিল,—রাধাকান্ত, রাধাকান্ত, রাধাকান্ত—

সত্যভামা চাপা সুরে গান ধরিয়াছে। কি গাহিতেছে?

—আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু—
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল—
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥

রাধা বৈষ্ণবের মেয়ে। মহাজন পদাবলী তাহার নিতান্ত ঘরের জিনিস। কতবার কত লোকের মুখে কত পদ সে শুনিয়াছে। ভাষার লালিত্যে সুরের মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু পদাবলীর অর্থ লইয়া ইহার পূর্বে কোনদিন সে মাথা ঘামায় নাই। আজ হঠাৎ মনে হইল বিদ্যাপতি ঠাকুর যেন তাহারই মনের কথা সুরে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন।—জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ—সত্যই আজ তাহার দেহ মন প্রাণ সার্থক হইয়া গিয়াছে।—টুটল সবহুঁ সন্দেহা—রাধা চোখ বুজিয়া করজোড়ে বার বার ঠাকুরের পায়ে প্রণাম জানাইল।

সত্যভামা তখনও গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে। বিদ্যাপতি ছাড়িয়া চণ্ডীদাস ধরিয়াছে।

—পীরিতি পীরিতি সব জন কহে,
পীরিতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহে ত' পীরিতি,
নাহি মিলে যথা তথা॥
পীরিতি অন্তরে পীরিতি মন্তরে
পীরিতি সাধিল যে।
পীরিতি-রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান সে॥

পীরিতি! পী-রি-তি! পী-রি-তি—! বার বার বলিয়াও যেন আশ্ মেটে না। জিভ দিয়া ঠোঁট দিয়া কথাটাকে উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া বার বার চাখিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। অথচ কথাটা তেমন নূতন কিছু নহে। কীর্তনে কথকতায় ভাগবত পাঠের আসরে কথাটা বহুবার সে শুনিয়াছে। সমবয়সী সখীরা—তাহারা সকলেই বিবাহিতা—বৈষ্ণব-কুমারীর ভবিষ্যৎ জীবনের যে সুমধুর সম্ভাবনা কথাটার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে তাহা লইয়া কত রঙ্গ-রস করিয়াছে, কখনো কখনো একটু আধটু অশ্লীল ইঙ্গিত করিতেও ছাড়ে নাই। রাধার হাসি পাইতে লাগিল। সব ভুল! কিছুই তাহারা বুঝে নাই। এগার বারো বছর বয়সে সব বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বাপ মা যাহার হাতে সঁপিয়া দিয়াছে চোখ বুজিয়া তাহারই ঘর করিতেছে। পীরিতির মর্ম তাহারা কি বুঝিবে? রাধা নিজেই কি আর বুঝিত ছাই? সবই মদনমোহনের খেলা! কোথা হইতে কি হইয়া গেল! কাল যাহার নাম পর্যন্ত সে জানিত না, আজ কিনা হঠাৎ সে তাহার পায়ে হাত দিয়া বসিল!—রাধার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

পীরিতি! পী-রি-তি! বড় মজার জিনিস এই পীরিতি। একটু ভাবিতে গেলেই মন প্রসন্ন আনন্দের আলোকে ঝল্‌মল্ করিয়া ওঠে, অথচ চোখ ভারী হইয়া জলে ভরিয়া ওঠে। সহসা রাধার মনে হইল, তাহার যদি একটি ছোট খোকা থাকিত তাহা হইলে বেশ হইত। তাহাকে সে বুকে চাপিয়া চুমা খাইয়া আদর করিত, কোলে শোয়াইয়া বুকের দুধ খাওয়াইত, গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইত।

—কিন্তু দিদি-বৌ ও কি গান গাহিতেছে? ও কি গান?

—প্রেমেতে রাধিকা, স্নেহেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধাকান্ত নাম
পায়্যাছে অনেক আশে॥

রাধার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া নিশ্চল ভাবে সে বিছানায় পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যার পূর্বে সে ঘোষেদের কাছারি-পুকুর হইতে গা ধুইয়া আসিল। তাহার পর একখানি ধোপভাঙা রঙীন ডুরে শাড়ী পরিয়া ভালো করিয়া চুল আঁচড়াইয়া খোঁপা বাঁধিল, ভিজা গামছা দিয়া মুখখানি ঘসিয়া মাজিয়া তকতকে করিয়া লইল, কপালে একটি ছোট্ট খয়েরের টিপ্ পরিল, বাগান হইতে কয়েকটি বেলফুলের কুঁড়ি তুলিয়া আনিয়া খোঁপায় গুঁজিল। দুধের কেঁড়েটি কাঁখে লইয়া সে যখন বাড়ী হইতে বাহির হইল, তখন পদাবলীতে শোনা আর একটি কথা তাহার মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছিল।—অভিসার! অভিসার! আজ সে প্রথম অভিসারে চলিয়াছে। ব্রজের গোপিনী সে, প্রিয়-সম্মিলনে চলিয়াছে।···

—কৈ গো ঠাকুর মশাই, দুধ এনিছি।

রাধাকান্ত বোধ হয় তাহার প্রতীক্ষাই করিতেছিল। ডাক শুনিবা মাত্র বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু তাহার পরই লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাধার কিন্তু আর কোন লজ্জাই নাই। মনের সহিত বুঝাপড়া শেষ করিয়াই সে আসিয়াছে। স্বচ্ছ অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, রাধাকান্তের শাম্‌লা মুখ লাল্‌চে হইয়া উঠিয়াছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটু হাসিয়া বলিল,—দাঁড়াও ঠাকুর, আগে তোমাকে একটা পেরনাম করি! ওবেলা ভুলে গিইছিলাম। বামুনের ছেলে, বোষ্টমের মেয়ের পায়ে হাত দিয়ে বসলে! আমার পাপ হবে যে!

আঁচলটি গলায় জড়াইয়া লইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সে রাধাকান্তকে প্রণাম করিল, তাহার পর দক্ষিণ করাঙ্গুলির মৃদু স্পর্শ সহকারে তাহার পদধূলি লইয়া জিহ্বাগ্রভাগে ও মস্তকে ছোঁয়াইল। চক্ষু বুজিয়া মনে মনে বলিল,—আমি তোমার। তুমি আমার—এমন

চিন্তা তাহার মনের কোণেও জাগিল না। কিশোরী বৈষ্ণব-কুমারীর পক্ষে গোপীভাব সাধনালভ্য বস্তু নহে, স্বাভাবিক সংস্কার মাত্র।

—একি ঠাকুর মশাই! বাটি কৈ?

ঐ যাঃ! ভুল হইয়া গিয়াছে! রাধার পুনরাগমনের জন্য সে এমন আকুল আগ্রহে পথ চাহিয়া ছিল যে তাহাকে আসিতে দেখিয়াই ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। দুধের বাটির কথা তাহার মনেই পড়ে নাই। আরও বেশী লজ্জিত হইয়া সে রান্নাঘরের দিকে ছুটিল।

বাটি লইয়া বাহিরে আসিয়া রাধাকান্ত দেখিল, দুধের কেঁড়ে পাশে রাখিয়া রাধা রান্নাঘরের দাওয়ায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িয়াছে। রাধাকান্তকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—উনুনে কি চাপিয়েছো?

—ডাল।

—তবে এসো, বসে খানিক গল্প করি। মাষ্টার মশাই তো শিরোমণি ঠাকুরের আড্ডায় গেছেন, ফিরতি এখনো অনেক দেরী। বসো।

রাধাকান্ত যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিল না; সঙ্কোচে আনন্দে আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি—তুমি আমার ওপর রাগ করো নি?

রাধা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল,—দেখো পাগলের কাণ্ডখানা! তোমার ওপর রাগ করতি যাবো কেন গো? আমার নাম রাধা, তোমার নাম রাধাকান্ত। এতে তোমার আর অপ্‌রাধডা কোথায়? এ সব ঠাকুর দেবতার লীলেখেলা; তুমি আমি আর কি করতি পারি বলো?

বসিয়া বসিয়া আধঘণ্টা গল্প করার পর রাধা ঘরে ফিরিল।

এইরূপে মধ্যবঙ্গের সেই নিভৃত পল্লীর স্নিগ্ধ ছায়ায় ছায়ায় দুইটি কিশোর-কিশোরীর প্রেমলীলার পালা শুরু হইয়া গেল। গোলোক-পুরীর খিড়কির দরজা খুলিয়া আর দুইটি কিশোর-কিশোরী কৌতুক-প্রসন্ন নয়নে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মাস তিনেক কাটিয়া গেল। হেডমাষ্টার মহাশয় দুঃখ করিয়া বলেন, ঠাকুরটি তাঁহার মোটেই ভালো হয় নাই। রাধাকান্ত রান্নাবান্না কিছুই জানে বলিয়া মনে হয় না। নুন হলুদ লঙ্কা প্রভৃতির পরিমাণ সম্বন্ধে সে এমনই বেহিসাবী যে প্রায় অর্ধেক দিনই তাঁহাকে আধ-পেটা খাইয়া উঠিতে হয়। এই তো সেদিন সখ করিয়া সজিনার ডাঁটা লইয়া আসিলেন চচ্চড়ি খাইবেন বলিয়া। কিন্তু নুনে ঝালে পুড়াইয়া রাধাকান্ত এমন রান্নাই রাঁধিল যে তিনি মুখেও তুলিতে পারিলেন না।

রাধাকান্তের মন যে ইতিমধ্যে হাঁড়ি-হেঁশেলের রাজত্ব হইতে বিদায় লইয়া স্বপ্নলোকের টিকিট কিনিয়া উধাও হইয়া গিয়াছে, হেডমাষ্টার মহাশয় তাহা কি করিয়া জানিবেন? পীরিতি নগরে বসতি বাঁধিয়া যে মন দেয়া-নেয়ার কারবার খুলিয়াছে তাহাকে দিয়া কি আর চচ্চড়ি রাঁধানো যায়?

কথাটা প্রথম শ্যামচাঁদেরই কানে উঠিল। রাধার ক্রমবর্ধমান প্রসাধন-প্রীতি ও ঈষৎ অন্যমনস্ক উড়ু উড়ু ভাব অবশ্য বাড়ীর সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু ও বয়সে অমন সব মেয়েরই হয় বলিয়া ব্যাপারটিতে কেহ বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই। তাহা ছাড়া বৈষ্ণব বাড়ীতে মেয়েদের খুব বেশী চোখে চোখে রাখার দস্তুর কোন কালেই ছিল না।

বাজারের পথে ঘোষবাবুদের পেয়াদা লখাই সর্দার শ্যামচাঁদকে ধরিয়া বলিল,—শালী সামলাও বৈরিগি, নইলে এরপর হয়তো বড়ো এট্টা কেলেঙ্কারির মধ্যি পড়ে যাবা।

লখাই-এর মুখে শ্যামচাঁদ শুনিল, রাধা আজকাল প্রতিদিন ঠিক দুপুর বেলা সাজিয়া গুজিয়া কাছারি-পুকুরে জল আনিতে যায়। জল আনা না ছাই! ঠিক সেই সময় মাষ্টার মশাই-এর বাড়ীর রাঁধুনী বামুন ছোঁড়াটাও সেখানে আসিয়া জোটে। তাহার পর ঘাটের ধারের বকুল গাছের তলায় বসিয়া দুইজনে সে কি গল্প! বেলা

গড়াইয়া না গেলে আর সে গল্প ফুরায় না। দুপুর বেলা পাড়ার লোক বড় একটা ও পুকুরে আসে না—জায়গাটাও খুব নির্জন। কিন্তু তবু লোকের নজরে পড়িয়াছে, পাড়ায় একটু কানাঘুষা শুরু হইয়াছে। কথাটা ভালো নহে। সময় থাকিতে সতর্ক হওয়া উচিত।

শ্যামচাঁদ ব্যাপারটা শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইল। সত্যই ইহা ভালো কথা নহে। পরিণামে ইহা হইতে অতি জটিল সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু সে করিবেই বা কি? দোকান ও জমি-জমা লইয়া তাহাকে প্রায় অষ্টপ্রহরই অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকিতে হয়। এসব পারিবারিক ঝামেলা পোহাইবার সময় তাহার কোথায়? কথাটা বৈষ্ণবীদের কানে তুলিয়া দিলে অবশ্য তাহার দায়িত্ব খানিকটা ঘুচিয়া যায়। কিন্তু তাহারা মেয়েমানুষ। এখনই হয়তো চেঁচাইয়া মেচাইয়া সোরগোল তুলিয়া এমনই একটা কদর্য কাণ্ড করিয়া বসিবে যে ঘরে তিষ্ঠানো দায় হইবে। শ্যামচাঁদ আরও চিন্তিত হইয়া উঠিল, অনেক মাথা চুলকাইল, কিন্তু করিল না কিছুই।

শ্যামচাঁদ চুপ করিয়া থাকিলে কি হয়, পাড়ার লোক চুপ করিয়া থাকিল না। সেদিন বৈকালে রুক্মিণী গিয়াছিল কাছারি-পুকুরে জল আনিতে, তিনু কলুর বৌ তাহাকে ধরিয়া আচ্ছা করিয়া দশ কথা শুনাইয়া দিল। একখানাকে সাতখানা করিয়া বর্ণনা করিল, প্রথম প্রেমের নির্মল পুষ্পাঞ্জলিকে নিজের মনের পাঁক ছিটাইয়া ছিটাইয়া কুৎসিত গ্লানিময় করিয়া তুলিল, কিশোরী-হৃদয়ের পূর্বরাগকে স্বৈরিণীবৃত্তির সমপর্যায়-ভুক্ত করিয়া দেখাইল। তিক্ত তিরস্কার ও তিক্ততর উপদেশ বর্ষণ করিয়া রুক্মিণীর মন বিষাইয়া তুলিল।

রুক্মিণী কিছুই জানিত না, কোন দিন কোন সন্দেহও তাহার মনে উদিত হয় নাই। ছোট বোনটিকে সে এখনও ছেলেমানুষ বলিয়াই ভাবিত, তাহাকে বড়ই ভালোবাসিত। সেই কিনা এমন করিয়া তাহাদের মুখে চুনকালি দিল! তাহাদের উঁচু মাথা হেঁট করিয়া দিল। পুকুর হইতে সে একেবারে আগুন হইয়া ঘরে ফিরিল।

রাধা তখন বড়ঘরের দাওয়ায় বসিয়া বকুল ফুলের মালা গাঁথিতেছিল। দুম্ করিয়া দাওয়ার উপর জলের ঘড়াটা নামাইয়া রাখিয়া রুক্মিণী উঠিয়া গিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল ; রোষ-কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—কার জন্যি মালা গাঁথছিস্ রে ?

রাধা মুখ না তুলিয়াই ঈষৎ অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল,—ঠাকুরের জন্যি।

রুক্মিণী দেখিতে পাইল রাধার মুখে মৃদু একটু হাসির আভাস খেলিয়া গেল। সে একেবারে ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল। একটানে রাধার হাতের মালাটা ছিঁড়িয়া ফুলগুলা দূরে ছড়াইয়া ফেলিল, তাহার পর চুলের মুঠি ধরিয়া সজোরে তাহার পিঠে গুম্ গুম্ করিয়া গোটা পাঁচ ছয় কিল বসাইয়া দিল। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—ঠাকুর! তোর চোদ্দপুরুষের ঠাকুর! পাড়া-ঢলানি পোড়ারমুখী! নাগর পেইছিস্ ?—না ? নাগরের জন্যি ফুলের মালা গাঁথছিস্! গলায় দেবার দড়ি জোটে না ? ভগ্নীপতির ঘরে বসে দু'বেলা কাঁড়ি কাঁড়ি পিণ্ডি গিলছিস্, আর পাড়া যজিয়ে বেড়াচ্ছিস্। ওরে, তোর হাড়ে কি হায়া-পিত্তি কিচ্ছু নেই ? এদিকে আমাদের মুখ যে পুড়ে গেল।

চীৎকার শুনিয়া সত্যভামা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া রুক্মিণীর রোষের অনলে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। আরও গলা চড়াইয়া চেঁচাইতে শুরু করিল,—শোন গো শোন, তোমরা সব আমার ধিঙ্গি বোনের কিত্তি শোন। বোন আমার নাগর কেড়েছেন। রাঁধুনী বামুন, তিনকুলি কেউ নেই, পাঁচ টাকা মাইনের জন্যি দেশ ছেড়ে বিদেশে এসেছে,—তারই প্রেমের সাগরে রসবতী রাধা আমাদের একেবারে হাবুডুবু! পাড়ায় ঢি-ঢি পড়ে গেছে, লোকের কাছে আর মুখ দেখাবার যো নেই! —আসুক, বুড়ো আজ ঘরে ফিরুক। আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন। সেই তো আদর দিয়ে দিয়ে ছুঁড়ির মাথা খেয়েছে। আবার সাত গাঁ

তেরো সমাজ তোলপাড় করে বেড়ানো হচ্ছে,—কি না শালীর জন্যি ভালো পাত্তর চাই। এদিকে শালী যে নিজের পাত্তর নিজেই বেছে নিয়েছে, তার খবর কি রাখে কিছু বুড়ো ?

আচমকা আক্রমণে রাধা কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, কাঠের পুতুলের মত চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আবার আর এক দফা তাহার উপর কিল চড় বর্ষণ করিতে করিতে রুক্মিণী পাগলের মত চীৎকার করিতে লাগিল,—আহা—হা, মুখে আর কথাটি নেই! মেয়ে আমার ভাজা মাছখানি উল্‌টে খেতি জানেন না! ওরে ও মুখপুড়ী, বল্‌, সত্যি করে বল্‌, আমরা তো সারাদিনের হাড়ভাঙা দাসীবিত্তির পর মড়ার মতো পড়ে পড়ে ঘুমুই, তুই রাত্তিরে ঘরে থাকিস্ তো ? বল্—

চুলের মুঠিতে হেঁচকা টান দিয়া সে রাধাকে দাঁড় করাইল, তাহার পর তাহাকে ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে পুরিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিল, তাহার পর গুম্ হইয়া হাত পা কোলে করিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া রহিল। সংসারের সমস্ত কাজ সেদিন সত্যভামাকেই করিতে হইল। শ্যামচাঁদের বাড়ী পাড়ার মধ্যে নহে এই যা রক্ষা,—কেলেঙ্কারিটা বেশী দূর গড়াইল না।

রাত্রে শ্যামচাঁদ বাড়ী ফিরিলে কিন্তু রুক্মিণী তাহার সহিত একটি কথাও কহিল না। যেমন নিশ্চলভাবে বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া রহিল। সত্যভামার নিকট সব শুনিয়া শ্যামচাঁদ দুশ্চিন্তার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। অনবসরের অছিলায় যে সমস্যাটিকে সে ক্রমাগতই এড়াইয়া চলিতেছিল, অবশেষে সত্যই তাহা ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল! এখন উপায় ? চিন্তা সে অনেক করিয়াছে, কিন্তু চিন্তা করিয়া সমস্যার কিছু সুরাহা করিতে পারে নাই। এখন রাধামাধবই একমাত্র ভরসা। দেখা যাক্ তিনি কি করেন।

অনেক রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া বাড়ীর বাহিরে আঁচাইতে গিয়া শ্যামচাঁদ চাঁদের আলোয় দেখিতে পাইল কে একটা লোক সদর দরজার কাছে কামিনী ঝোপের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। মৃদু কণ্ঠে

জিজ্ঞাসা করিল,—কে ? কে ওখানে ? কোন উত্তর না পাইয়া কাছে গিয়া দেখিল, রাধাকান্ত। শ্যামচাঁদকে দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে মুখ কাঁচুমাচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—রাধা—রাধা আজ দুধ দিতে যায় নি কেন ? তার কি কোন অসুখ করেছে ?

শ্যামচাঁদ বলিল,—এই যে ঠাকুর, তুমি এসেছো, ভালোই হয়েছে। ভাবছিলাম সকাল বেলা একবার তোমাদের ওখানে যাবো। তুমি মাষ্টার মশাইকে বলে দিয়ো, আমাদের গাই-এর দুধ শুকিয়ে গেছে, আমরা আর দুধ দিতি পারবো না।

তাহার পর রাধাকান্তের চোখে চোখে চাহিয়া সামান্য একটু জোর দিয়া বলিল,—রাধা আর তোমাদের বাড়ী যাবে না।

রাধাকান্ত শ্যামচাঁদের ইঙ্গিতটি বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। তাহার মুখখানা হঠাৎ মলিন নিষ্প্রভ হইয়া গেল, চোখ দুইটা চক্ চক্ করিয়া উঠিল। পিছন ফিরিয়া খানিকটা দূর চলিয়া গিয়াছে এমন সময় শ্যামচাঁদ ডাকিল,—শোন ঠাকুর, আর একটা কথা শুনে যাও।

রাধাকান্ত ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—কাছে এসো।

কাছে আসিলে শ্যামচাঁদ দেখিল ছেলেটা কাঁদিতেছে। অত্যন্ত অসহায় নিরীহ জীবের মত নিঃশব্দে কাঁদিতেছে ; টপ্ টপ্ করিয়া চোখের কোণ বাহিয়া জল ঝরিতেছে। কোঁচার খুঁট দিয়া চোখ মুছিবার কথাও তাহার মনে নাই। শ্যামচাঁদের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। কিন্তু জোর করিয়া কঠিন হইয়া সে কহিল,—আর কখনো তুমি আমাদের বাড়ীর আশেপাশেও এসো না ঠাকুর। রুক্মিণী বোষ্টুমী যদি দেখতি পায়, হুড়কো দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে।

রাধাকান্ত যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দেই ফিরিয়া গেল।

সে রাত্রে রাধা ও রাধার দিদি কেহই জলস্পর্শ করিল না।

পরদিন সকালে রুক্মিণী আবার রাধাকে লইয়া পড়িল। মিষ্ট কথায় অনেক বুঝাইল, অনেক চোখের জল ফেলিল, অনেক গালি-গালাজ করিল। বলিল, রাধা শুধু একবার তাহার গা ছুঁইয়া শপথ করুক সে আর কখনো রাধাকান্তের সহিত গোপনে দেখা করিবে না, তাহা হইলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে। শ্যামচাঁদ ভালো ঘর-বর দেখিয়া তাহার বিবাহ দিবে, নূতন ভায়রাকে নিজের ভিটায় ঘর বাঁধিয়া বাস করাইবে। তাহাদের ছেলে-মেয়ে কিছুই নাই, রাধাই তাহাদের একমাত্র সম্বল। তাহারা চোখ বুজিলে রাধারই তো সব হইবে! তবে কেন সে এমন অবুঝ হইল?—সে কি জানে না, সোমত্থ মেয়ের নামে একবার কলঙ্ক রটিলে সে কলঙ্ক ঘুচানো কত শক্ত? জানিয়া শুনিয়া তবে সে এমন সর্বনাশের পথে পা বাড়াইল কেন?

বহুক্ষণ রাধা নীরবে সব সহ্য করিল। অবশেষে অনিদ্রা ও অবিরাম অশ্রুপাতে আরক্তিম দুই চক্ষু দিদির মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল,—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, তোমরা আর আমাকে এমন করে আটকে রেখো না। আমাকে ছেড়ে দ্যাও। আমি তোমাদের কিচ্ছু চাই নে,—বোষ্টমের মেয়ে, না হয় পথে পথে ভিক্ষে করে খাবো। কিন্তু তোমরা আমাকে ছেড়ে দ্যাও। ওরে না দেখতি পেলি আমি মরে যাবো।

রুক্মিণী ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। হাতের কাছে একগাছা ঝাঁটা পড়িয়া ছিল; তাহাই তুলিয়া লইয়া সপাসপ্ রাধাকে পিটাইতে শুরু করিল। সত্যভামা একবার ছুটিয়া আসিয়াছিল বাধা দিতে, কিন্তু রুক্মিণীর রণ-রঙ্গিণী মূর্তি দেখিয়া ভয়ে পিছাইয়া গেল। রাধা নীরবে পড়িয়া পড়িয়া চোরের মার খাইতে লাগিল।

গোলোক-পুরীর খিড়কির দরজা দিয়া যে দুই জোড়া চক্ষু সাগ্রহে নীচের দিকে চাহিয়া ছিল, তাহারা বেদনায় করুণ হইয়া উঠিল।

দুইটি দিন কাটিয়া গেল। রুক্মিণীর ভগিনী-নির্যাতন সমান ভাবে চলিতে লাগিল। রাধাও খায় না দায় না, সেই যে ভূমিশয্যা গ্রহণ

করিয়াছে, আর তাহা ছাড়িয়া উঠিল না। শ্যামচাঁদ ভাবিয়া ভাবিয়া প্রায় পাগল হইতে বসিল। মেয়েটা কি শেষকালে মরিয়াই যাইবে? তাহার এখন কি করা উচিত? রাধাকেও বলিবার কিছু সে খুঁজিয়া পায় না, রুক্মিণীকেও সামলাইতে পারে না। তাহার সুখের সংসারে ঠাকুর একি অশান্তির আগুন জ্বালিয়া দিলেন।

তৃতীয় দিন ভোর বেলা সত্যভামা কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যাত্যাগ করিল। মর্মান্তিক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। অবিলম্বে শ্যামচাঁদ ও রুক্মিণীকে ডাকিয়া তাহাদের নিকট সে নিজের স্বপ্নকাহিনী বর্ণনা করিল।—স্বপ্নে সে দেখিয়াছে যেন সে ঘোষবাবুদের ঠাকুরঘরের বন্ধ দরজার সামনে সিঁড়ির উপর বসিয়া আছে। চারিদিকে আর কেহ কোথাও নাই। এমন সময় হঠাৎ দড়াম্ করিয়া দরজা খুলিয়া গেল, চাহিয়া দেখে সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বয়ং মদনমোহন। চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে, দুঃখে রাগে একখানা মুখ যেন দশখানা হইযা ফাটিয়া পড়িতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে সত্যভামাকে বলিলেন,—দ্যাখ্ দ্যাখ্, তোর সতীন আমার সোনার রাই-এর কি দশা করেছে, একবার চেয়ে দ্যাখ্!

সত্যভামা ঠাকুরঘরের ভিতর চাহিয়া দেখিল, স্রস্তবসনা শ্রীরাধিকা সিংহাসন ছাড়িয়া আসিয়া মাটির উপর পড়িয়া লুটাইতেছেন। তাঁহার কাঁচা সোনার বর্ণ পিঠের উপর ঝাঁটার দাগ রক্তের মত লাল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সত্যভামা পুনরায় কাঁদিতে লাগিল। রুক্মিণীর মুখ ভয়ে শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। কি সর্বনাশ! ভোরের স্বপ্ন! এ তো কখনো মিথ্যা হইতে পারে না। তাহার সর্বশরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল, বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। একি মহাপাপ সে করিয়া বসিল। —শ্যামচাঁদের দুই চক্ষু দিয়া অবিরল ধারে ভাবাশ্রু ঝরিতে লাগিল; অস্ফুট গদ্‌গদ কণ্ঠে সে মাঝে মাঝে উচ্চারণ করিতে লাগিল,—জয় রাধামাধব! জয় রাধামাধব!

তাহার পর একদিন গুরু-গোঁসাই সাক্ষী রাখিয়া রাধাকান্ত কণ্ঠি পরিয়া ভেক ধারণ করিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল। আরও কয়েকদিন পরে শুভদিনে শুভক্ষণে রাধার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। গোলোক-পুরীর খিড়কির দরজা দিয়া নূপুরের চপল শিঞ্জন ও চাপাহাসির কলধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল।

ভালো চচ্চড়ি রাঁধিতে পারে এমন আর কোন ঠাকুরের সন্ধান করিতে না পারিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় তাড়াতাড়ি দেশ হইতে গৃহিণীকে ফিরাইয়া আনিলেন।

রাধাকান্ত আজকাল শ্যামচাঁদের বাড়ীতেই থাকে ও বাজারের বেনেতি মশলার দোকানখানি দেখাশোনা করে। শ্যামচাঁদ জমি-জমার তদ্বির করে ও ঘরে বসিয়া মনের আনন্দে একতারা বাজাইয়া গান গায়।

সত্যভামা বৈষ্ণবী যেদিন সমগ্র কাহিনীটি সবিস্তারে গাঙ্গুলি পিসীর নিকট বর্ণনা করে সেদিন আমি কাছেই বসিয়া ছিলাম। নিজের স্বপ্নের কথা বলিবার সময় সেদিন তাহার মুখে চোখে মৃদু কৌতুকের হাসির আভাস আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম কিনা এতকাল পরে তাহা আর হলপ করিয়া বলিতে পারি না।

ছেলেবেলায় গ্রামে অনেক পাগল দেখিয়াছি। ইহাদের কয়েকজনকে জীবনে ভুলিতে পারিব না। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ অতি সহজেই অন্যান্য মানুষের অস্তিত্ব ক্রিয়াকলাপ ও সুখদুঃখকে মানিয়া লইতে শিখে। মানুষের সহিত পরিচয়ের সম্বন্ধটাই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। অপরিচয়ের মধ্যে যে ভীতি ও রহস্য নিহিত আছে তাহাকে নিতান্ত অবাঞ্ছিত বস্তুর ন্যায় দূরে ঠেলিয়া রাখা হয়। ইহার ফলে মন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয় বটে, কিন্তু কৌতূহলহীনতার জড়িমা তাহাকে খানিকটা পঙ্গুও করিয়া ফেলে। পরিচয়ের শক্ত পাঁচিল দিয়া ঘেরা আমার শৈশব-জীবনের সেই ক্ষুদ্র আঙিনার চারিদিকে এই সব পাগলরাই ছিল যেন ছোট ছোট ঘুলঘুলি। ইহাদের বিচিত্র আচরণ ও মনোভাবের মধ্য দিয়া আমি বাহিরের অপরিচিত জগৎ-টার কিছু কিছু আভাস পাইতাম। মানুষেব মনের গভীর গহনে যে রহস্য লুকাইয়া আছে পাগলের পাগলামিই প্রথম আমাকে তাহার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল।

হাবার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহা ছাড়া আমাদের বাড়ীব পাশেই তারানাথ ঘোষাল ওরফে তারা পাগ্‌লা বাস করিত। তারানাথের বয়স তখন পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হইবে, রুগ্‌ণ শীর্ণ চেহারা, চওড়া উঁচু কপালের উপর কদমছাঁট দেওয়া কাঁচাপাকা চুলের সূক্ষ্মাগ্র অন্তরীপ, তাহাব দুই পাশে ক্রমসঙ্কীর্ণ টাকের রেখা মাথার মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। সমগ্র মুখের মধ্যে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুবৃহৎ একটি নাসিকা; মনে হয় যেন মুখের অন্যান্য সমস্ত অংশ চুপ্‌সাইয়া তুব্‌ড়াইয়া একমাত্র নাক-লোকের মধ্যেই উর্ধ্বগতি লাভ করিয়াছে।

উত্তরাধিকার-সূত্রে তারানাথ যে সামান্য জমিজমা লাভ করিয়াছিল তাহাতেই কায়ক্লেশে তাহার সংসার চলিয়া যাইত।

কিন্তু সে সগৌরবে সর্বত্র ঘোষণা করিয়া বেড়াইত যে তাহার পেশা কবিরাজি। বাড়ীর বাহিরে সে যেখানেই যাইত সর্বদা হাতে একটি গোল টিনের কৌটা বহন করিয়া বেড়াইত। এই কৌটাটির মধ্যেই তাহার কবিরাজিবিদ্যার সমস্ত পুঁজিপাটা সঞ্চিত থাকিত। চিকিৎসক হিসাবে কোন রোগী কোনদিন তাহার নিকট আসিয়াছে কিংবা তাহাকে বাড়ীতে ডাকিয়াছে এমন কথা অবশ্য কেহ শুনে নাই। কিন্তু সে জন্য তাহার কোন সঙ্কোচ ছিল না। গ্রামে কাহারও কোনরূপ অসুখ-বিসুখ হইয়াছে সংবাদ পাইলে সে নিজেই রোগীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইত। ঔষধ দিত, অনুপান সংগ্রহ করিয়া দিত এবং সম্ভব হইলে ঔষধের প্রথম মাত্রাটি স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিয়া আসিত। রোগী বা রোগীর আত্মীয়-স্বজন এই ব্যাপারে যদি বিন্দুমাত্র আপত্তি করিত তাহা হইলে চটিয়া লাল হইয়া উঠিত, চীৎকার করিয়া কদর্য গালি-গালাজ দিয়া একেবারে একটা অনর্থ বাধাইয়া বসিত। পূবপাড়ার গেনু চক্রবর্তীর একবার সামান্য জ্বর হয়। সংবাদ পাইয়াই তারানাথ ছুটিয়া গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সেদিন গেনুর মেজাজটা তেমন ভাল ছিল না, গাঁজার মাত্রাটাও বোধ হয় একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। তারানাথকে দেখিয়া খ্যাক্-ম্যাক্ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—এই ব্যাটা পাগ্‌লা, কি করতে এসেছিস রে? কে তোকে ডেকেছে? চিকিচ্ছে করবেন! কবরেজ হয়েছেন! দূর হ' আমার বাড়ী থেকে, দূর হ'। চিকিচ্ছের তুই কি জানিস রে, ব্যাটা নাকেশ্বর? তুই যেদিন কবরেজ হবি, তেলাপোকাও সেদিন পাখি হবে। বিনি চিকিচ্ছেয় মরবো সেও বি আচ্ছা, তবু তোর অষুধ খাবো না। যা! পালা!

বাস্! আর যায় কোথায়! প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়া তারানাথ মুহূর্তের মধ্যে সংহার মূর্তি ধারণ করিল,—তবে রে হারামজাদা! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমি ছিষ্টিধর কবরেজের হাতে গড়া

সাকরেদ, আমার বিদ্যের অপমান! তোকে আজ মেরেই ফেলবো। দেখি তোর কোন বাপ তোকে বাঁচায়!

উঠানে একখানা ভারী কুড়ুল পড়িয়া ছিল। তাহাই হাতে লইয়া তারানাথ গেনুকে আক্রমণ করিতে ছুটিল। গেনু যদি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া না দিত তাহা হইলে সেদিন বোধ হয় পাগল তাহাকে খুনই করিয়া ফেলিত। গেনুকে না পাইয়া তারানাথ দমাদ্দম্ দরজার উপর কুড়ুল মারিতে লাগিল, আর ঘরের ভিতর হইতে গেনু পরিত্রাহি চীৎকার করিতে লাগিল। অবশেষে পাড়া-পড়শীর দল আসিয়া পড়িল এবং অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া পাগলকে শান্ত করিয়া ঘরে ফিরাইয়া লইয়া গেল। ইহার পর তারানাথ জীবনে আর কোনদিন গেনুর সহিত বাক্যালাপ করে নাই। দৈবাৎ পথে ঘাটে তাহার সহিত দেখা হইয়া গেলেও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইত।

তারানাথের পুঁজি ছিল মাত্র তিনটি ঔষধ,—বৃহৎ বাতচিন্তামণি, মহালক্ষ্মীবিলাস ও চ্যবনপ্রাশ। রোগ যাহাই হউক না কেন, ইহার বাহিরে সে কোন ঔষধই প্রয়োগ করিত না। রক্ষা এই যে সে নিজে ঔষধ প্রস্তুত করিত না, পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন দেখিয়া গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া কলিকাতা হইতে ভি-পি করিয়া আনাইত। কাজেই তাহার ঔষধ খাইয়া বিশেষ কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ইহা লইয়া আস্ফালন করিতেও সে ছাড়িত না, বলিত,—ওরে বাবা, একি তোদের ঐ আকাট মুখ্যু শ্রীধর সেনের ফাঁকিবাজির কারখানায় গোঁজামিল দিয়ে তৈরি অষুধ? এ হলো খাঁটি আয়ুর্বেদোক্ত প্রণালীতে তৈরি দিব্যশক্তি সম্পন্ন অষুধ। বিশ্ববিশ্রুত হলধর আয়ুর্বেদীয় ফার্ম্মাসীতে প্রস্তুত—৬৭৬ নং অপার চিৎপুর রোড। যাস্ যদি কলকাতায় কোনদিন, দেখে আসিস, কবরেজি অষুধ তৈরির অত বড় কারখানা আর ভূভারতে নেই। এসব অষুধ ডাকলে ডাক শোনেন।

স্থানীয় ডাক্তার কবিরাজ সকলেরই উপর তারানাথের ছিল বিষম ক্রোধ। সে নিজে বিশ্বাস করিত এবং সকলকে বলিয়া বেড়াইত যে ইহারাই ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার হাতের সমস্ত রোগী ছিনাইয়া লয়। ডাক্তারদের সে রসিকতা করিয়া 'কাঁচাখেকো দেব্‌তা, বলিয়া উল্লেখ করিত। কিন্তু বিশেষ করিয়া একজন চিকিৎসককে সে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না—সে শ্রীধর কবিরাজ। শ্রীধর ও তারানাথ একবয়সী। একই গুরুর নিকট, অর্থাৎ শ্রীধরের পিতা স্বর্গীয় কবিরাজ সৃষ্টিধর সেন বিদ্যাবিশারদের নিকট দুই-জনেরই কবিরাজি বিদ্যার হাতে খড়ি হয়। অথচ আজ শ্রীধর কবিরাজ সমাজে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, সকাল-বিকাল তাহার বাড়ীতে রোগীর হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়, বহুদূরের গ্রাম হইতে তাহার জন্য চিকিৎসার আহ্বান আসে—শুনা যায় ইহার মধ্যেই সে বেশ দু'পয়সা করিয়া ফেলিয়াছে। আর তাহাকে কেহ কবিরাজ বলিয়া মানিতেই চাহে না। গায়ের জ্বালা মিটাইবার অন্য উপায় না পাইয়া পাগল গালি পাড়িতে থাকে।

—শালা ওঝার ব্যাটা বনগরু! শালা গণ্ডমুখ্যু বোকরেজ! ঠক জোচ্চোর ব্যাটা, বাপের পুণ্যে করে খাচ্ছে, তার আবার বড়াই কত! ব্যাটা অষুধ তৈরি করে! চুলোর ওপর হর্তুকী আমলকীর পিণ্ডি ফোটালেই অষুধ হয়ে গেল আর কি! বলি ষড়গুণ-বলিজারিত অষুধ কখনো চোখে দেখেছে? পুটপাকের নাম কানে শুনেছে? বলুক তো দেখি হারামজাদা তির্জ্জকপাতন জিনিসটা কি? কবরেজি করা মুখের কথা কি না! নিদান-নির্ণয় করবার সাধ্যি থাকা চাই, টন্‌টনে নাড়ীজ্ঞান থাকা চাই। হ্যাঁ, সে বলতে পারি আমি—এই তারানাথ ঘোষাল। রুগীর নাড়ী ধরে তার হাঁড়ির খবর বলে দিতে পারি

পাঠশালায় পড়িবার সময় তারানাথ গুরুমশাইয়ের নিকট সুপ্রচুর বেত্রাঘাত লাভের সঙ্গে সঙ্গে বারংবার শুনিত যে তাহার মত নিরেট-

মস্তিষ্ক জীবের কোন দিন লেখাপড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রাক্তন সহপাঠী শ্রীধর যেদিন ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া বাপের নিকট কবিরাজি শিক্ষা শুরু করিল, সেও পাঠশালার দড়ি ছিঁড়িয়া আসিয়া বিদ্যাবিশারদ মহাশয়ের ঔষধালয়ে হামানদিস্তা ও খলনোড়ার সাকরেদিতে লাগিয়া গেল। কিন্তু দুই দিন পরেই যখন কবিরাজ মহাশয় "মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং;" স্মরণ করিয়া তাঁহার দুই ছাত্রকে মুগ্ধবোধ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, তখন তারানাথের প্লীহা চম্‌কাইয়া গেল। আবার লেখাপড়া! কবিরাজি শিখিতে আসিয়াও নিস্তার নাই?

যথাসময়ে তারানাথ ও শ্রীধর মহকুমা শহরে গিয়া ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষা দিয়া আসিল। শ্রীধর তো পাশ করিলই, সমস্ত গ্রামকে অবাক করিয়া দিয়া তারানাথও পাশ করিয়া গেল। পরে অবশ্য জানা গিয়াছিল, পরীক্ষাগৃহে তারানাথের ঠিক পাশেই যে "টুলো ভূত"-টির সিট্ পড়িয়াছিল তাহার অসতর্কতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তারানাথ তাহারই অর্ধসমাপ্ত খাতাখানি নাকি নিজের নাম লিখিয়া দাখিল করিয়া দিয়া আসিয়াছিল। পাগল হইলেই যে বোকা হইতে হইবে এমন তো কোন কথা নাই!

কিন্তু ঐ পর্যন্তই শেষ। শ্রীধর ক্রমে ক্রমে ব্যাকরণ কাব্য ও সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষা পাশ করিয়া ফেলিল, তাহার পর চরক সুশ্রুত আধগত করিয়া চেলা-কবিরাজ হিসাবে বাপের সঙ্গে রোগী দেখিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তারানাথ ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষার বেড়া আর কোনদিন ডিঙাইতে পারিল না। বাকল সংগ্রহ করিয়া আর ঔষধের পুরিয়া বাঁধিয়াই তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

সৃষ্টিধর সেন মহাশয়ের মৃত্যুর পর যখন শ্রীধর স্বাধীন ভাবে কবিরাজি শুরু করিল, তখন আর তাহার সহ্য হইল না। গ্রামে ঘোষণা করিয়া দিল সেও কবিরাজি করিবে। কেন, সেই বা কম কিসে? বিদ্যাবিশারদের হাতে-গড়া ছাত্র সে—না হয় কতকগুলা

পরীক্ষাই পাশ করিতে পারে নাই, কিন্তু কবিরাজি বিদ্যার অন্ধি-সন্ধি তাহার কি কিছু শিখিতে বাকি আছে?

শুভদিন শুভক্ষণ দেখিয়া সে নিজের বাড়ীর দরজায় বড় বড় হরপে লেখা একখানা সাইন বোর্ড টাঙাইয়া দিল।

ধন্বন্তরীকল্প ৺ সৃষ্টিধর সেন বিদ্যাবিশারদের
প্রিয়তম ছাত্র—
কবিরাজ—শ্রীতারানাথ ঘোষাল আদ্যবিশারদ

তাহার পর গলায় চাদর ঝুলাইয়া সেই বিখ্যাত গোল টিনের কৌটাটি হাতে লইয়া রোগীর সন্ধানে এপাড়া ওপাড়া হাঁটাহাঁটি জুড়িয়া দিল। গ্রামের লোক পাগলের কাণ্ড দেখিয়া হাসাহাসি করিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে তারা পাগ্লার আবার নূতন নূতন ক্যাপামি চাগাইয়া উঠিত। একবার এইরকম একটা আজগুবি কাণ্ড করিতে গিয়া সে মরিতে বসিয়াছিল।

রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে দশটা। শিরোমণি মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডা ভাঙিয়া গিয়াছে, তিনি একা বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন। এমন সময় তারানাথ উদ্ভ্রান্তের মত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর শিরোমণি মহাশয়কে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই প্রশ্ন করিয়া বসিল,—আচ্ছা খুড়োমশাই, আপনি তো পণ্ডিত মানুষ, অনেক পড়াশুনো করেছেন,—বলতে পারেন পারদ-বন্ধন কি করে করতে হয়?

শিরোমণি মহাশয় তো অবাক। পাগ্লা বলে কি! বলিলেন —পারদ-বন্ধন? সে আবার কি বস্তু বাবা? কোনকালে নাম শুনেছি বলেও তো মনে পড়ে না।

—কেন? এই তো, দেখুন না।—তারানাথ একখানা পুরানো পুঁথির পাতা খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল।

শিরোমণি মহাশয় দেখিলেন পুঁথিখানি মাধবাচার্যের "সর্বদর্শন-

সংগ্রহ"। বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—এ পুঁথি তুমি পেলে কোথায় তারানাথ?

তারানাথ বেঁকা বুঝিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল,—কেন? আমি কি একখানা সংস্কৃত পুঁথি পড়াবারও বিদ্যে রাখি নে? আপনারা ভাবেন কি বলুন তো? দুনিয়ার সব বিদ্যে কি এক ঐ শ্রীধর কবরেজের পেটেই আছে?—মরুক্ গে যাক্ সে কথা, এখন এই দেখুন! রসেশ্বর দর্শন অধ্যায়ে কি লিখেছে দেখুন,—"বদ্ধঃ খেচরতাং কুর্য্যাৎ"। অর্থাৎ কি না পারদকে বন্ধন করতে পারলে মানুষ পাখির মত আকাশে উড়ে বেড়াতে পারবে। শাস্তরের কথা, এ তো মিথ্যে হবার নয়। তা ছাড়া হরনাথ পণ্ডিতকে দিয়ে আমি শোলোকটার মানে করিয়ে নিয়েছি,—ওতে কোন ভুল নেই। তাহলে বুঝুন একবার ব্যাপারটা! বেলুন ফেলুন বিলিতি বুজরুকির আর কোন দরকার হবে না। দরকার হলো শুধু এই পারদ-বন্ধন প্রক্রিয়াটা শিখে নেওয়া। বাস্, তারপর ইচ্ছেমত তীর্থদর্শন করে বেড়াও, হিল্লী দিল্লী ঘুরে বেড়াও—রেল কোম্পানি বলো ইষ্টিমার কোম্পানি বলো কাউকে একটি পয়সাও দিতে হবে না, সব শালার গালে মাছি যাবে।—তা খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম তন্ত্রশাস্তরে নাকি লেখা আছে কি করে পারদ-বন্ধন করতে হয়। তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম, আপনি কি কিছু হদিস দিতে পারেন?

হাসি চাপিয়া শিরোমণি মহাশয় বলিলেন,—কিন্তু বাপু, তন্ত্রশাস্ত্র তো এক আধখানা বই নয়—সে অনেক পুঁথি, পুঁথির পাহাড়। আমি দুই একখানা পড়েছি বটে, কিন্তু তার মধ্যে কোথাও পারদ-বন্ধনের কথা কিছু পাই নি।

শিরোমণি মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা লইয়া তারানাথ ঘরে ফিরিয়া গেল।

তাহার পর দিন কাটিতে লাগিল। তারানাথ যথারীতি শ্রীধর কবিরাজের মুণ্ডপাত করিতে লাগিল এবং রোগীর সন্ধানে পাড়ায়

পাড়ায় টোকলা সাধিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু তাহার সেই উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা ঘুচিল না। তাহা ছাড়া আজকাল সে মাঝে মাঝে হঠাৎ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। দুই একদিন পরেই আবার ফিরিয়া আসে বটে, কিন্তু কোথায় যায় কি উদ্দেশ্যে যায় কিছুই কাহারও নিকট প্রকাশ করে না।

এমনি ভাবে কিছুদিন চলিবার পর একদিন ঠিকদুপুর বেলা পাড়ায় মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। তারানাথ ঘোষালকে সাপে কাটিয়াছে। কি সর্বনাশ! দেখিতে দেখিতে ঘোষাল বাড়ীর সামনে লোকারণ্য হইয়া গেল, গ্রামের লোক ভাঙিয়া পড়িল। আমরাও ছুটিলাম।

গিয়া দেখিলাম, বাহিরের ঘরের দাওয়ার উপর তারানাথ চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। আশে পাশে একদল লোক ভিড় করিয়া বসিয়া ও দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বাঁ হাতে কনুই-এর উপরে ও নীচে শক্ত করিয়া গোটাতিনেক তাগা বাঁধা। মুখ নীল হইয়া গিয়াছে, গোঙাইয়া গোঙাইয়া অস্পষ্ট ভাষায় কি সব বলিতেছে। উঠানের এক কোণে একটা লোক দুই হাতে মাথা ধরিয়া উবু হইয়া বসিয়া আছে। পাড়ার ছেলেদের প্রহারের চোটে তাহার নাকটা ভাঙিয়া থ্যাব্‌ড়া হইয়া গিয়াছে, একটা চোখ ফুলিয়া সম্পূর্ণ বুজিয়া গিয়াছে, মুখের দুইটা দাঁত ভাঙিয়া লালা ও রক্ত ঝরিতেছে, পিঠের উপর দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া কালশিরা পড়িয়াছে। লোকটা অচৈতন্যের মত নিঝ্‌ঝুম হইয়া বসিয়া আছে। জন দুই ষণ্ডামার্ক চেহারার ছোকরা লাঠি হাতে তাহাকে পাহারা দিতেছে। উঠানের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড শাদা গোখ্‌রো সাপ মরিয়া পড়িয়া আছে।

ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ পরে আমরা শিরোমণি মহাশয়ের মুখে শুনি।

পারদ-বন্ধন প্রক্রিয়ার সন্ধান তারানাথ ছাড়ে নাই। কিন্তু সে বুঝিয়াছিল ইহার জন্য কোন তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষের সাহায্য প্রয়োজন। পরাক্রমপুরের শ্মশানে এই রকম একজন মহাপুরুষ বাস করেন শুনিয়া

সে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যায়। লোকটা জাতে বাগ্‌দী, কালো মহিষের মত চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, দুই চক্ষু জবাফুলের মত টকটকে লাল। এক টানে এক ছিলিম গাঁজা ছাই করিয়া দিতে পারে, এক চুমুকে এক ভাঁড় ধেনো শেষ করিতে পারে। দেখিয়া শুনিয়া তারানাথের ভারী ভক্তি হইল। তাহার পর শুরু হইল মহাপুরুষ তোষণের পালা।

অনেক তোষামোদ ও সাধ্যসাধনার পর, সিধা ও নেশার সামগ্রী বাবদ অনেক দণ্ড দেওয়ার পর মহাপুরুষ সদয় হইলেন এবং তারানাথকে পারদ-বন্ধনের গোপন প্রক্রিয়াটি বলিয়া দিলেন। প্রক্রিয়াটি এইরূপ :

শনিবার অমাবস্যা বেলা সার্ধ-দ্বিপ্রহরের সময় একটি বিষধর শ্বেত-গোক্ষুর সর্প সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে। তাহার পর তাহাকে এক তোলা পরিমাণ কাঁচা পারা খাওয়াইয়া দিয়া তাহার কণ্ঠের ঠিক নিম্নে ও মলদ্বারের ঠিক উপরে দুইটি শক্ত বাঁধন বাঁধিয়া দিতে হইবে। তাহার পর সাপটিকে একটা হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া মুখে সরা চাপা দিয়া বালির মধ্যে জীবন্ত পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে। ইহার ফলে সর্পদেহ হইতে মাংস খসিয়া পড়িবে এবং দেখা যাইবে সর্পের কঙ্কালটি স্বর্ণে পরিণত হইয়াছে। সেই স্বর্ণ চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ ও মধু সহযোগে সেবন করিলে পারদ-বন্ধনের ফল পাওয়া যাইবে, পাখির মত স্বচ্ছন্দে আকাশ-পথে ভ্রমণ করা যাইবে।

আজ সেই শুভক্ষণ ছিল। পাঁচ টাকা মূল্য কব্‌লাইয়া ওপারের রাখু বেদের নিকট হইতে শ্বেতগোক্ষুর সংগ্রহ করা হইয়াছিল। রাখু নিজেই সাপটি লইয়া আসিয়াছিল। তাহার পর বাহিরের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দুইজনে মিলিয়া প্রক্রিয়া শুরু করে। কিন্তু প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়েই সব ভণ্ডুল হইয়া যায়। জোর করিয়া পারা খাওয়াইবার সময় সাপটি রাখুর হাত হইতে পিছলাইয়া যায় এবং তারানাথের বাঁ হাঁতের কব্জিতে দংশন করে। তারানাথ হাউ-মাউ

করিয়া চীৎকার করিয়া উঠে এবং রাখু ভয় পাইয়া হাঁড়িশুদ্ধ সাপ লইয়া পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু তারানাথের আর্তনাদে পাড়ার লোকজন আসিয়া পড়ে। তাহার পর ছেলেরা লাঠি দিয়া পিটাইয়া সাপটিকে মারিয়া ফেলে এবং রাখুকে আধমরা করিয়া ফেলে।

কিন্তু তারা পাগ্‌লা সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

প্রহারের ধকলটা একটু সামলাইয়া উঠিবার পর রাখু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—বাবুরা আমার একটা কথাও শুনলে না, শুধু শুধু বিনি দোষে মেরে আমার হাড়গোড় চুন্ন করে দিলে! ও সাপের তো বিষ নেই। আসবার ঠিক আগেই আমি ওরে কামিয়ে নিয়ে এইছি। টাকার লোভে আমি কি এমন কুকম্মো কখনো করতি পারি? বিষদাঁতওয়াল্যা সাপ কি কখনো পাড়ার মধ্যি আনতি পারি?

তারানাথের মুখ নীল হইয়া গিয়াছিল বিষক্রিয়ার ফলে নয়, মৃত্যুভয়ে।

পুরাতনকে লইয়া দিন কাটাইবার উপায় নাই, কারণ একটা নূতন উপসর্গ দেখা দিয়াছে। বাত হইয়াছে।

পূর্বস্মৃতির সুর বাজে মনের তারে, কিন্তু বাতের বেদনা স্নায়ুর তার ধরিয়া নাড়া দেয়। মগজের ভিতরটা পর্যন্ত ঝন্ ঝন্ করিয়া ওঠে।

হাঁটিলে লাঠি ধরিয়া খোঁড়াইতে হয়, বসিলে কট্‌কটানি বাড়িয়া যায়, শুইয়াও স্বস্তি নাই। সারারাত্রি এপাশ ওপাশ করিয়া উঃ আঃ করিয়া কাটাইবার পর শেষ রাত্রে গৃহিণী বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কি একটা ঘুমের ঔষধ খাওয়াইয়া দিয়া গেলেন। ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

মনে হইল কে যেন আমার কাঁধ ধরিয়া ঠেলিতেছে। চাহিয়া দেখিলাম হাজু স্যাক্‌রার ছেলে রাখাল। পোকায় খাওয়া ফোক্‌লা দাঁত মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। বলিল,—আর কত ঘুমোবা ছোট্‌ঠাকুর? ওঠ! হারাণ দত্তের কুলগাছে এবার অনেক কুল ফলেছে। চলো কুল খেয়ে আসি।

রসনা রসার্দ্র হইয়া উঠিল। কতকাল কুল খাই নাই! বলিলাম, —চল্ যাই।—কিন্তু রাখাল আমার কথা শুনিতে পাইল না। এক ছুটে পুব্‌পাড়ার দিকে চলিয়া গেল। বাতে খোঁড়া পা লইয়া তাহার নাগাল ধরিতে পারিলাম না।...

এবার আসিলেন অঙ্কের মাষ্টার হরিসাধন বাবু। নাকের কাছ দিয়া সাঁ করিয়া বেতটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন,—ছত্রিশটা অঙ্ক কষতে দিয়েছিলাম, কষেছ মাত্র পনেরটা। নীল ডাউন হয়ে থাকো!

মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলাম,—কি করে নীল ডাউন হবো সার? হাঁটুতে যে বড্ড ব্যথা!

হরিসাধন বাবুর বিরস মুখের উপর দিয়া হাসির বিদ্যুল্লেখা নিমেষের জন্য ঝিলিক মারিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন? হাঁটুতে ব্যথা কেন? এর মধ্যেই বাতে ধরেছে নাকি?

হাতের বেতটা আবার সাঁ করিয়া উঠিল, পড়িল ঠিক হাঁটুর উপর। যন্ত্রণায় চোখ বুজিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলাম।···

—কি বাত হয়েছে নাকি?

চাহিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ গোপাল তহশীলদার মহাশয় লাঠি হাতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমার দিকে আসিতেছেন। এক গাল হাসিয়া বলিলেন,—তোমরা বাবা আজকালকার ছেলে, বললে তো কিছু শুনবে না! বাত হয়েছে তা ডাক্তার-বদ্যিতে কি করবে? ও রোগ কি অষুধে সারে? গুল বাঁধো! এই দেখো না আমি গুল বেঁধে কেমন ভালো আছি!—ছুরি দিয়ে চেঁছে একটা ছোট নিমকাঠের ছিপি তৈরি করে নাও, তার একটা দিক যেন একটু ছুঁচলো মত থাকে। তারপর সেই ছুঁচলো দিকটা পায়ের ডিমের ওপর চেপে তার ওপরে একটা পানপাতা বসিয়ে নেকড়ার একটা ফেট্টি দিয়ে বেশ শক্ত করে বেঁধে দাও, এই যেমন আমার পায়ে বাঁধা আছে ঠিক তেমনি করে। দুদিনের মধ্যেই ছিপিটা চামড়া ফুটো করে মাংসের মধ্যে বসে যাবে। তখন ঐ ফুটো দিয়ে বাতের যত বদরক্ত সব ঝরে পড়ে যাবে, আর বেদনা থাকবে না। রোজ শুধু একবার করে গরম নিমজল দিয়ে ঘাটা ধুয়ে ফেলতে হবে।—বাস্! তাহলেই তুমি আমার মত সেরে উঠবে, আর বাতে ভুগতে হবে না।

তহশীলদার মহাশয় খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাজারের পথ ধরিয়া চলিয়া গেলেন।···

সর্দারপাড়া হইতে মাদলের ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। আজ সারারাত উহারা নাচিবে। আমার নাচিবার উপায় নাই। আমার পায়ে বাত হইয়াছে।...

এমন সময় দূর হইতে দীর্ঘচ্ছন্দিত নারীকণ্ঠের ডাক শুনিতে পাইলাম, গোবিন্দ—, গোবিন্দরে, আয় বাবা! গোবিন্দ—

বিরজাপিসীর গলা। বিরজাপিসীর একমাত্র ছেলে গোবিন্দ দুপুর বেলা নদীতে স্নান করিতে গিয়া জলে ডুবিয়া মরিয়া যায়। বিরজাপিসী তখন রান্নাঘরে ভাত বাড়িয়া বসিয়া আছে।

ইহার কিছুদিন পরে বিরজাপিসী কোথা হইতে একটা কুকুরছানা কুড়াইয়া লইয়া আসিল, তাহারই নাম রাখিল গোবিন্দ। বলিল,— এই আমার ছেলে।

বিরজাপিসী সেই কুকুর-গোবিন্দকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। নদীর তীর ধরিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে আর মাঝে মাঝে ডাক ছাড়িতেছে, গোবিন্দ—, গোবিন্দরে! কেমন যেন কান্নার মত শুনাইতেছে।

কেন জানি না, হঠাৎ আমার মনে হইল, আমিই গোবিন্দ। আমার মা আমার জন্য পঞ্চব্যঞ্জনের আহার্য সাজাইয়া আমাকে ডাকিতেছে।

—গোবিন্দ -, গোবিন্দরে, আয় বাবা!

প্রাণপণে চীৎকার করিয়া সাড়া দিলাম,—যাই মা! গলার স্বর ফুটিল না। শুধু ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া দেখি চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িয়াছে। তখনও বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিতেছি, —যাই মা! যাই মা!

কেমন করিয়া যাইব মা? আমার যে পায়ে বাত হইয়াছে।

শুধু পায়ে নয়, মনেও বাত হইয়াছে।

আর ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই। তোমার শূন্য কোল আর ভরিবে না।...

ছায়াছবির মিছিল চলিয়াছে। চলিবার পথে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া যায়। হাসিয়া যায়, হাসাইয়া যায় ; কাঁদিয়া যায়, কাঁদাইয়া যায়।

অন্তহীন মিছিলের পিছনে ফুটিয়া ওঠে একখানি গ্রামের ছবি, একটি নদীর ছবি।

গ্রামের নামটি ধানসোনা।

আর নদীর নামটি নীলা।